বাংলাদেশের কৃষি

Agriculture of Bangladesh

ইউনিট ২

ভূমিকা

সাধারণ অর্থে কৃষি বলতে ভূমি কর্ষন করে ফসল ফলানো বুঝায়। কিন্তু অর্থনীতিতে কৃষি কথাটি আরো ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়। অর্থনীতিতে পশুপালন থেকে শুরু করে শস্য উৎপাদন, বনায়ন, খনিজ ও মৎস সম্পদ আহরণ প্রভৃতি সকল প্রকার প্রাকৃতিক সম্পদ আহরণ প্রক্রিয়াকে কৃষির অন্তর্ভুক্ত করা হয়। বাংলাদেশ একটি কৃষি প্রধান দেশ। কৃষি দেশের অর্থনীতির একটি অপরিহার্য উপাদান।

ইউনিট সমাপ্তির সময়	ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ৭ দিন

এই ইউনিটের পাঠসমূহ

পাঠ ২.১: কৃষির কাঠামো ও বৈশিষ্ট্য
পাঠ ২.২: কৃষি খামার ও কৃষি জাত
পাঠ ২.৩: কৃষিপণ্যের বিপনণ সমস্যা
পাঠ ২.৪: কৃষিখাতে পরিবর্তনের গতিধারা
পাঠ ২.৫: কৃষি ঋণ ও কৃষি উপকরণ বিতরণ
পাঠ ২.৬: শস্য বহুমুখীকরণ ও সেচ সুবিধা সম্প্রসারণ
পাঠ ২.৭: আধুনিক কৃষি ব্যবস্থা

পাঠ ২.১ কৃষির কাঠামো ও বৈশিষ্ট্য
Structure and Features of Agriculture

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা-

- বাংলাদেশের কৃষি কাঠামোর বিবরণ দিতে পারবেন;
- বাংলাদেশের কৃষির বৈশিষ্ট্যসমূহ বর্ণনা করতে পারবেন;
- বাংলাদেশের কৃষির উপাদানসমূহের বিবরণ দিতে পারবেন;
- জিডিপিতে কৃষির উপাদানসমূহের অবদানের চিত্র তুলে ধরতে পারবেন।

মূলপাঠ

বাংলাদেশ একটি কৃষি প্রধান দেশ। কৃষি বাংলাদেশের অর্থনীতির প্রধান কর্মকান্ড এবং চালিকাশক্তি। উৎপাদনশীলতা ও আয় বৃদ্ধি এবং গ্রামীণ এলাকায় কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে বিশাল জনগোষ্ঠীর সমৃদ্ধির জন্য কৃষির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। দেশের জিডিপিতে কৃষি খাত (ফসল,মৎস্য, প্রাণিসম্পদ এবং বন) গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে। শ্রম শক্তির প্রায় অর্ধেক কর্মসংস্থান যোগান দেয় এবং কৃষি ভিত্তিক শিল্প প্রতিষ্ঠানের প্রধান কাঁচামাল সরবরাহ করে। কৃষি সামাজিক কর্মকান্ডের এক বিশেষ ক্ষেত্রে যা জনগনের খাদ্য ও পুষ্টির নিশ্চয়তা, আয়ের সুযোগ সৃষ্টি এবং দারিদ্র্য হ্রাসকরণের মত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোর সাথে ওতোপ্রোতভাবে জড়িত। এছাড়া, কৃষি বিভিন্ন ধরনের ভোগ্যপণ্যের বিশেষ করে গ্রামীণ এলাকায় ভোক্তাদের চাহিদাভিত্তিক মালামালের উৎস। তাই গ্রামীণ দারিদ্র্য হ্রাসকরণে কৃষিক্ষেত্রের উন্নয়ন এবং এর প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিত করা অপরিহার্য।

বাংলাদেশের কৃষি কাঠামো:

বাংলাদেশের অর্থনীতিতে কৃষির অবস্থান ও গুরুত্ব, উৎপাদনের উদ্দেশ্য, ভূমিস্বত্ব ব্যবস্থা, খামারের আয়তন, উৎপাদন ব্যবস্থা, কৃষির বিভিন্ন উপখাতের তুলনামূলক গুরুত্ব ইত্যাদি দিয়ে গঠিত কৃষি খাতের সার্বিক অবস্থাকে বাংলাদেশের কৃষি কাঠামো বুঝায়। প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশ এবং অর্থনীতির উন্নয়ন স্তর কৃষি কাঠামোকে প্রভাবিত করে বলে দেশভেদে এর প্রকৃতি ভিন্ন হয়। নিচে বাংলাদেশের অর্থনীতির কৃষি কাঠামো আলোচনা করা হলো:

১. **ভূমি কর্ষণ:** বাংলাদেশের অধিকাংশ কৃষক নিজের জমি চাষ করে। এ ধরনের মালিক চাষীর দ্বারা আমাদের মোট আবাদযোগ্য জমির প্রায় ৭৫ শতাংশ কর্ষিত হয়। এ ছাড়া আছে বর্গাচাষী যারা নির্দিষ্ট শর্তে অন্যের জমি চাষ করে। বাংলাদেশের ২০ শতাংশ আবাদি জমি বর্গা চাষের অধীনে রয়েছে। আবার অনেক সময় ঋণের প্রয়োজনে জমির মালিক জমি বন্ধক দিয়ে ঋণ গ্রহন করে। এরূপ ক্ষেত্রে ঋণদাতা ঋণ পরিশোধ না হওয়া পর্যন্ত জমিচাষ করতে থাকে। আবার কিছু কিছু ক্ষেত্রে কৃষক একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য পূর্ব নির্ধারিত অর্থ কিংবা ফসলের বিনিময়ে অন্যের জমি ভাড়া নিয়ে চাষ করে।

২. **চাষ পদ্ধতি:** আমাদের দেশে এখনও পুরাতন চাষাবাদ পদ্ধতির প্রাধান্য রয়েছে। আমাদের কৃষক এখনও লাঙল গরুর সাহায্যে জমি চাষ করে। উন্নত জাতের বীজ ও রাসায়নিক সারের ব্যবহার কম। তবে বর্তমানে উচ্চ ফলনশীল বীজ প্রচলিত হওয়ায় আমাদের কৃষির আধুনিকীকরণের যাত্রা শুরু হয়েছে।

৩. **জমি-জনসংখ্যা অনুপাত:** কৃষির উপর অত্যধিক নির্ভরশীলতার জন্য বাংলাদেশে জমি-জনসংখ্যা অনুপাত (*land − man ratio*) অত্যন্ত নিম্ন। দেশের প্রায় ৭৭ শতাংশ মানুষ গ্রামে বাস করে এবং কৃষিই তাদের প্রধান উপজীবিকা। ফলে পরিবারের সকলেই ক্ষুদ্রায়তন পৈত্রিক জমি চাষ করে। বিকল্প নিয়োগের অভাবে আমাদের

কৃষিতে বহু অপ্রয়োজনীয় শ্রমিক নিয়োজিত রয়েছে। ফলে জমিতে নিয়োজিত শ্রমিকের কিছু অংশের প্রান্তিক উপাদান শূন্য। তাই আমাদের কৃষিতে ছদ্মবেশী বেকারত্বের প্রকোপ খুব বেশি।

৪. **খামার ব্যবস্থা:** বাংলাদেশে জীবন ধারণোপযোগী খামার ব্যবস্থা (Subsistence farming) প্রচলিত রয়েছে। জীবন ধারনোপযোগী খামারে পরিবারে ভরণ-পোষণের জন্য যে বিভিন্ন ফসলের প্রয়োজন হয় সম্ভব হলে তা প্রায় সকলই একই খামারে উৎপাদন করার চেষ্টা করা হয়। এদেশে এখনও বানিজ্যিক খামার ব্যবস্থা (Commercial farming) প্রসার লাভ করে নি।

৫. **খামারের আয়তন:** আয়তন অনুযায়ী বাংলাদেশের কৃষি খামারগুলোকে ৪ ভাগে ভাগ করা হয়েছে। এর মধ্যে ০.০৫-০.৪৯ একরের খামার গুলো প্রান্তিক খামার, ০.৫০-২.৪৯ একরের খামারগুলো ক্ষুদ্রায়তন খামার, ২.৫০-৭.৪৯ একর আয়তনের খামারগলো মাঝারি এবং ৭.৫০ একর হতে আরো বড় আকারের খামারগুলো বৃহদায়তন খামারের অন্তর্ভুক্ত।

৬. **ভূমি বন্টন:** বাংলাদেশের ভূমিবন্টন ব্যবস্থায় প্রচন্ড বৈষম্য রয়েছে। ২০০5 সালে উচ্চ দারিদ্র্য রেখা ব্যবহার করে দারিদ্র্য পরিমাপে দেখা যায় যে, দেশের প্রায় ৪৬.৩ শতাংশ জনগনই ভূমিহীন। আবার সামান্য হলেও জমি আছে এমন কৃষি খামারগুলোকে অন্তর্ভুক্ত করে পরিচালিত Agriculture sample survey of Bangladesh-2005 পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, দেশের ৬২.১৭ শতাংশ খামারের আয়তন এক একরের নিচে। অর্থাৎ এ সকল খামারের মালিকরা সকলেই ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষী। উপরের পরিসংখ্যান হতে দেখা যাচ্ছে যে, দেশের প্রায় অর্ধেক জনগণই ভূমিহীন। আবার যাদের ভূমি আছে তাদেরও অধিকাংশ নগণ্য পরিমাণ জমির মালিক।

৭. **কৃষি পণ্যের ধরণ:** বাংলাদেশের কৃষিতে দু ধরনের ফসল উৎপাদিত হয়,যথা: (ক) খাদ্য শস্য এবং (খ) অর্থকরী ফসল ধান, গম, ভূট্টা, ডাল, তৈলবীজ, শাক-সবজি, ফলমূল প্রভৃতি প্রধান খাদ্যশস্য। অন্যদিকে অর্থকরী ফসলের মধ্যে রয়েছে পাঠ, ইক্ষু, রেশম, তুলা, ইত্যাদি। তাছাড়া কৃষক তার বাড়ির আঙ্গিনায় গরু, মহিষ, হাঁস-মুরগি পালন করে। তাবে বানিজ্যিক ভিত্তিতে পশু পালন ও হাঁস-মুরগির খামারের সংখ্যা এখনও খুবই কম।

৮. **জাতীয় অর্থনীতিতে কৃষির অবদান:** কৃষি বাংলাদেশের অর্থনীতির প্রধান খাত। দেশের শ্রম শক্তির প্রায় ৪৯ শতাংশ কৃষি খাতে নিয়োজিত রয়েছে। ২০১৪-২০১৫ অর্থবছরে বাংলাদেশের দেশজ উৎপাদনের (জি.ডি.পি) মৎস্য খাতসহকৃষি খাতের অবদান ছিল ১৬.০০ শতাংশ। কৃষি উৎপাদনের উপর বাংলাদেশের প্রবৃদ্ধির হার নির্ভর করে। ফসল ভাল হলে প্রবৃদ্ধির হার বাড়ে এবং শস্যহানিতে প্রবৃদ্ধির হারহ্রাসপায়।

৯. **কৃষির উপখাত:** পূর্বে কৃষির বিভিন্ন উপখাত হিসেবে শস্য/ফসল,মৎস্য, পশু, ও বনজসম্পদকে বিবেচনা করা হতো। বর্তমানে কৃষির উপখাত হলো শস্য ও শাকসবজি, প্রাণি সম্পদ এবং বনজ সম্পদ। মৎস্য সম্পদ বর্তমানে উন্নত কৃষি খাত।

১০. **খাদ্যশস্য উৎপাদন :** আশির দশকের প্রারম্ভে (১৯৮০/৮১) চালের উৎপাদন ছিল প্রায় ১৩৯ লক্ষ মেট্রিক টন। এখন বিভিন্ন কারণে আবাদযোগ্য জমির পরমানহ্রাস পেলেও এ উৎপাদন ২০১৪/১৫ সালে দাঁড়ায় ৩৮৪.১৯ লক্ষ মেট্রিক টন। এসময় গম ১৩.৪৮ ও ভূট্টা ২৩.৬১ লক্ষ মে. টন উৎপাদন হয়েছে।

১১. **খাদ্যশস্য আমদানি:** ১৯৯৫/৯৬ সালে মোট খাদ্য আমদানির পরিমাণ ছিল ২৪.২৭ লক্ষ মে. টন। ২০১৩/১৪ অর্থবছরে তা দাঁড়ায় ৩১.২৪ লক্ষ মে. টন (চাল ৩.৭৪ লক্ষ মে.টন এবং গম ২৭.৫০ লক্ষ মে. টন)। জনসংখ্যা অনেক বৃদ্ধি পেলেও অভ্যন্তরীণ খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির কারণে আমদানির পরিমান সে হারে বাড়েনি।

১২. **বীজ উৎপাদন:** বাংলাদেশে কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) সারা দেশে ২৪ টি দানা শস্য বীজ উৎপাদন খামার, ২টি পাট বীজ উৎপাদন খামার, ২টি আলু বীজ উৎপাদন খামার,৩টি ডাল ও তৈল বীজ উৎপাদন খামার,২টি সবজি বীজ উৎপাদন খামার, ও ৭৩টি চুক্তিবদ্ধ চাষি জোনের মাধ্যমে বীজ উৎপাদন কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। এ ছাড়া, ৯টি উদ্যান উন্নয়ন কেন্দ্র ও ১৪টি এগ্রো সার্ভিস সেন্টারের মাধ্যমে উৎপাদিত বিভিন্ন ফসলের চারা, কলম, গুট ইত্যাদি উৎপাদন ও চাষি পর্যায়ে বিতরণ কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

১৩. **সেচ:** বৈশ্বিক উষ্ণায়ন,জলবায়ু পরিবর্তন, আন্তর্জাতিক নদীতে পানি প্রবাহহ্রাস ইত্যাদি বিষয় বিবেচনায় রেখে ভূ-গর্ভস্থ পানির চাপ কমানোর লক্ষ্যে এবং ভূ-উপরস্থ পানি সংরক্ষণ ও ব্যবহারে অপচয়হ্রাসের মাধ্যমে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে সেচকৃত জমির পরিমান বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০০৪-০৫ ও ২০১৪-১৫ অর্থবছরে সেচভূক্ত এলাকা ছিল যথাক্রমে ৪৬.৫২ ও ৫৪.৪৮ লক্ষ হেক্টর।

১৪. **কৃষি ঋণ:** দেশের খাদ্য নিরাপত্তা জোরদার তথা সার্বিক আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে কৃষিখাত এবং পল্লী অঞ্চলের ভূমিকা সমুন্নত রাখার লক্ষ্যে কৃষি ঋণের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। ২০০১-০২ বিতরণ অর্থবছরে কৃষিঋণ করা হয়েছে ৩০১৯.৬৭ কোটি টাকা যা ২০১৪-১৫ অর্থবছরে প্রায় ১৫,৯৭৮.৪৬ কোটি টাকায় উত্তীর্ণ হয়।

১৫. **সরকারের অংশগ্রহন:** বাংলাদেশে কৃষিকাজ সম্পূর্ণরূপে বেসরকারী উদ্যোগে পরিচালিত হলেও এক্ষেত্রে সরকারের সক্রিয় সহযোগীতা রয়েছে। কৃষি উৎপাদন বিশেষ করে করে খাদ্যোৎপাদন বৃদ্ধির জন্য কৃষিতে আধুনিকীকরণের যে উদ্যোগ নেয়া হয়েছে তাতে সরকারি অংশগ্রহন গুরুত্বপূর্ণ। কৃষি খাতের সার্বিক উন্নয়নের জন্য ক্ষুদ্র সেচ সম্প্রসারণ, জলাবদ্ধতা নিরসন,উন্নতমানের ও উচ্চফলনশীল বীজ উৎপাদন,সংরক্ষণ ও বিতরণ প্রভৃতি কার্যক্রম গ্রহন করা হয়েছে। পরমানু ও বায়োটেকনোলজি পদ্ধতি ব্যবহার করে কীট-পতঙ্গ ও রোগ বালাই মুক্ত, খরা লবণাক্ততা সহিষ্ণু,আবহাওয়া পরিবেশ উপযোগী এবং স্বল্প সময়ে ফসল পাওয়া যায় এ লক্ষ্যে বিভিন্ন শস্যবীজের উপর গবেষণা পরিচালিত হচ্ছে।

বাংলাদেশের কৃষির বৈশিষ্ট্যসমূহ

বাংলাদেশ কৃষি প্রধান হলেও আমাদের কৃষিব্যবস্থা অনুন্নত। ফলে বাংলাদেশের কৃষির কতগুলা পার্থক্য সূচক বৈশিষ্ট্য দেখা যায় তা হল:

১. **প্রাচীন চাষ পদ্ধতি:** যান্ত্রিক সভ্যতার যুগেও বাংলাদেশে এখনও মান্ধাতা আমলের কাঠের লাঙল এবং জীর্ণশির্ণ গরু দ্বারা চাষাবাদ করা হয়। উন্নত মানের বীজ ও সার এবং কিটনাশক ঔষধপত্রের ব্যবহার খুবই কম। চাষের জমিতে পানি সরবরাহের জন্য এদেশের কৃষকেরা প্রকৃতির খেয়াল খুশির উপর নির্ভরশীল।

২. **কৃষকদের নিম্ন উৎপাদন ক্ষমতা:** বাংলাদেশের কৃষকেরা অত্যন্ত দরিদ্র। জীবনধারনের জন্য মৌলিক প্রয়োজন খাদ্য, বস্ত্র ও বাসস্থান থেকে অধিকাংশ কৃষক বঞ্চিত। শিক্ষা ও চিকিৎসার সুযোগ গ্রহনে অক্ষম। পুষ্টিহীনতা তাদের নিত্য সাথী এবং ভগ্নস্বাস্থ্য তাদের সম্বল। ফলে উৎপাদন ক্ষমতা তাদের খুবই কম।

৩. **অনাবাদী জমি:** বাংলাদেশের আবাদী জমির পরিমাণ অত্যন্ত অল্প। প্রায় ১৬ কোটি লোকের মাত্র ২ কোটি ২৫ লক্ষ একর জমি চাষাবাদের উপযোগী। অথচ চাষ উপযোগী প্রায় ২৫ লক্ষ একর জমি অনাবাদী অবস্থায় রয়েছে। শুধু তাই নয়, এ অল্প চাষের জমি থেকেও প্রতিবছর বিভিন্ন কারণে কয়েক লক্ষ একর জমি পতিত থাকে।

৪. **জীবন ধারণের নিমিত্তে উৎপাদন:** আমেরিকা, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া ও অন্যান্য উন্নত দেশের কৃষিকার্য বাণিজ্যিক ভিত্তিতে পরিচালিত হয়। কিন্তু, বাংলাদেশে খুব কম কৃষক পরিবার ভরণপোষণের জন্য প্রয়োজনীয় শস্যের অতিরিক্ত শস্য উৎপাদন করে থাকে।

৫. **ভূমিহীন কৃষক:** বাংলাদেশের কৃষি ব্যবস্থার আর একটি নৈরাশ্যজনক দিক হলো ভূমিহীন কৃষকের অস্তিত্ব। বাংলাদেশের ৫০ শতাংশের ও অধিক কৃষক পরিবার কার্যত ভূমিহীন। তারা অন্যের জমিতে চাষাবাদ করে। এই সমস্ত ভূমিহীন কৃষকেরা স্বাভাবিক ভাবেই কৃষিকাজে তেমন উৎসাহ বোধ করেন না। আমাদের দেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে ভূমিহীন কৃষকের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে।

৬. **মাথাপিছু জমির পরিমান কম:** বাংলাদেশে মাথাপিছু গড় জমির পরিমান ২৫ শতাংশের মত। খুবই কম সংখ্যক কৃষক পরিবার কৃষি অর্থনৈতিক জোতের অধিকারি।

৭. **প্রকৃতির উপর নির্ভরশীলতা:** বাংলাদেশের কৃষকদের চাষাবাদ করতে যে পানির প্রয়োজন পড়ে তার জন্য তারা প্রকৃতির উপর নির্ভর করে। দক্ষিণ পশ্চিম মৌসুমি বায়ুর প্রভাবে বাংলাদেশে বৃষ্টিপাত হয়। এ বৃষ্টিপাতের উপর বাংলাদেশের কৃষকেরা জমি চাষাবাদের জন্য নির্ভরশীল। কিন্তু এ বৃষ্টিপাতের কোন নিশ্চয়তা নেই। অনাবৃষ্টি, অতিবৃষ্টি ও অসময়ে বৃষ্টি হলে কৃষির উৎপাদন অস্বাভাবিকভাবে কম হয়।

৮. **এক ফসল উৎপাদন:** বাংলাদেশে অধিকাংশ জমিতে শুধুমাত্র একটি ফসল উৎপাদন করা হয়। কিন্তু উন্নত দেশের জমিতে একাধিক ফসল উৎপাদন করা হয়।

৯. **খাদ্যশস্যের প্রাধান্য:** আমাদের কৃষিতে খাদ্যশস্যের চাষবেশি এবং অর্থকরী ফসলের চাষ কম। কারণ গরিব কৃষকেরা মূলত পরিবারের খাদ্যের চাহিদা মেটানোর পর অবশিষ্ট জমিতে অর্থকরী ফসল চাষ করে।

১০. **দুর্যোগ কবলিত কৃষি:** প্রাকৃতিক দুর্যোগের শিকারে বাংলাদেশের কৃষির উৎপাদন অনেক সময় অত্যন্ত কম হয়। বন্যা, ঘুর্ণিঝড়, সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস প্রভৃতি প্রাকৃতিক দুর্যোগ তো আছেই। তা ছাড়াও আছে কিটপতঙ্গের আক্রমণ। এ সকল কারণে প্রতিবছর অনেক ফসল নষ্ট হয়।

১১. **শ্রম নিবিড় প্রযুক্তি:** বাংলাদেশের কৃষকেরা খুবই গরিব তাছাড়া জনবহুল এ দেশটিতে শ্রম খুবই সস্তা। তাই আমাদের কৃষিতে মূলত আধুনিক যন্ত্রপাতির পরিবর্তে শ্রম নিবিড় প্রযুক্তি ব্যবহৃত হয়।

১২. **ভাগ চাষ পদ্ধতি:** ভাগ বা বর্গা চাষ কৃষির একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য ধনী কৃষকেরা অনেক সময় নিজেরা জমি চাষাবাদ করে না। বর্গা চাষীরা এ সকল জমি মালিককে ফসলের একটি নির্দিষ্ট অংশ দেয়ার শর্তে চাষ করে। সাধারণত বর্গা চাষিরা জমির উন্নতি করতে আগ্রহী হয় না।

১৩. **ছদ্মবেশী বেকার:** বর্ধিত জনসংখ্যার চাপে এবং কৃষি ছাড়া অন্যখাতে কর্মসংস্থানের সুযোগের সীমাবদ্ধতার জন্য কৃষিতে প্রয়োজনের চেয়ে বেশি শ্রমিকের সমাবেশ ঘটে। কিন্তু এর ফলে উৎপাদন বড়ে না। জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও কৃষির আধুনিকীকরণের সাথে এরূপ ছদ্মবেশী বেকারের সংখ্যা ক্রমাগত বাড়তেই থাকে।

১৪. **নিম্নমানের শস্য উৎপাদন:** বাংলাদেশের কৃষকেরা উন্নত দেশের তুলনায় নিম্নমানের শস্য উৎপাদন করে। ফলে কৃষকেরা বাজার মূল্য অপেক্ষা তাদের উৎপাদিত শস্যের জন্য কম মূল্য পায়।তাছাড়া এদেশে আরো অনেক খাদ্য শস্য উৎপাদন করা হয় যার খাদ্য মূল্য অত্যন্ত কম।

১৫. **অতিরিক্ত উপবিভাগ ও বিচ্ছিন্নতা:** বাংলাদেশের কৃষি জমিতে অতিরিক্ত উপবিভাগ ও বিচ্ছিন্নতা দেখা যায়। ফলে আধুনিক পদ্ধতিতে চাষাবাদ করা অসুবিধাজনক।

১৬. **অদক্ষ কৃষি শ্রমিক:** বাংলাদেশের প্রায় সব কৃষকেরা অদক্ষ ও অশিক্ষিত; কৃষির উৎপাদন ক্ষেত্রে তাদের কোন প্রকার কারিগরি জ্ঞান নেই । কারণ বাংলাদেশে সাধারণ শিক্ষা ও কৃষি শিক্ষার সুযোগ সুবিধা অত্যন্ত কম।

সংক্ষেপে এগুলোই মূলত বাংলাদেশের কৃষির বৈশিষ্ট্য

বাংলাদেশের কৃষির উপখাতসমূহ

বাংলাদেশের কৃষিখাত তিনটি প্রধান উপখাত নিয়ে গঠিত। এগুলো হলো: (ক) শস্য ও শাক-সবজি, (খ) প্রাণিসম্পদ ও (গ) বনজ সম্পদ। কিন্তু সার্বিক কৃষি খাতের মধ্যে মৎস্য সম্পদকে একটি উপখাত হিসেবে গণ্য করা যায়।

(ক) শস্য ও শাক-সবজি (*Crops and vegetables*) : এটি বাংলাদেশের কৃষির সর্ববৃহৎ উপখাত। এ খাতে বিভিন্ন ধরনের খাদ্য শস্য যেমন ধান, গম, ভুট্টা, ডাল, তৈলবীজ, বাদাম, পিয়াজ, রসুন,আদা, হলুদ এবং বিভিন্ন ধরনের শাক-সবজি যেমন লাল শাক, পালং শাক, পটল, ঢেরস, করলা, লাউ, বেগুন, শসা, টমেটো, কপি ইত্যাদি উৎপাদিত হয়। তাছাড়া এ উপখাতে বিভিন্ন ধরনেরর অর্থকারী ফসল যেমন পাট, চা, আখ, তামাক, রেশম, তুলা, রবার ইত্যাদি উৎপাদিত হয়। দেশের লোকদের খাদ্য ও শিল্পের কাঁচামালের চাহিদা পূরণ করা ছাড়াও এ উপখাতে উৎপাদিত পণ্য বিদেশে রপ্তানি করে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জিত হয়। বর্তমানে এদেশের মোট দেশজ উৎপাদনের শতকরা ১২.২৭% ভাগ শস্য ও শাক-সবজি উপখাতের সৃষ্টি।

(খ) প্রাণিসম্পদ (*Livestock*): গৃহে পালিত নানাজাতীয় পশু-পাখি নিয়েই বাংলাদেশের প্রাণিসম্পদ উপখাত গঠিত। গরু, মহিষ, ছাগল, ভেড়া, ঘোড়া,হাঁস-মুরগি, কবুতর প্রভৃতি এদেশের প্রাণিসম্পদের অন্তর্ভূক্ত। প্রাণি সম্পদ থেকে প্রাপ্ত মাংস, দুধ, ডিম, ইত্যাদি মানব দেহের অত্যাবশ্যকীয় প্রাণিজ আমিষের চাহিদা পূরণ করে। তাছাড়া চাষাবাদ, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, চামড়া ও চমড়া জাতীয় দ্রব্যদি উৎপাদন ও রপ্তানিতে এ উপখাতের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ।

(গ) বনজ সম্পদ(*Forest Resources*): এটি আমাদের কৃষির একটি গুরুত্বপূর্ণ উপখাত। বাংলাদেশের মোট ভূখন্ডের শতকরা প্রায় ১৭ ভাগ জুড়ে বন রয়েছে। বনে সুন্দরি, গড়ান, গেওয়া, কেওড়া, শাল, গর্জন, গামাড়ি, গোলপাতা প্রভৃতি গাছ জন্মে। এগুলো থেকে দেশের কাঠের চাহিদার সিংহভাগ পূরণ হয় এবং কয়েকটি শিল্পের কাঁচামালের যোগান আসে। জ্বালানি কাঠ, বাঁশ, বেত, মোম, মধু, বিভিন্ন ধরনের ফলমূল, ইত্যাদি এ উপখাত থেকে পাওয়া যায়।

(ঘ) মৎস্য সম্পদ(*Fisheries*): বাংলাদেশের অর্থনীতিতে মৎস্য সম্পদের বিপুল সম্ভাবনা থাকায় বাংলাদেশ সরকার একে একটি পৃথক খাত হিসেবে গণ্য করেছে। তবে সার্বিক বিবেচনায় এ খাতও কৃষিখাতের অন্তর্ভূক্ত। বাংলাদেশের

অসংখ্য নদী-নালা, খাল-বিল, পুকুরে বিভিন্ন প্রজাতির মাছ পাওয়া যায়। এছাড়াও দেশের সামুদ্রিক মৎস্য ক্ষেত্রগুলো থেকে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ মাছ আহরিত হয়। বর্তমানে দেশের জিডিপিতে মৎস্য সম্পদের অবদান হলো ৩.৬৯ শতাংশ।

জিডিপিতে কৃষির উপখাত সমূহের অবদান

Contribution of the sub - sectors of Agriculture along with Fishery in GDP

বাংলাদেশ একটি কৃষি প্রধান দেশ হওয়ায় এখানকার অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের ক্ষেত্রে এটি একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ খাত। অবশ্য সময় অতিবাহিত হওয়ার সাথে সাথে এ দেশের জিডিপিতে এ খাতের অবদান ক্রমশ কমে আসছে। তাই দেখা যায় যে, বিগত শতকের সত্তরের দশকে এ দেশের জিডিপিতে কৃষি খাতের অবদান ছিল শতকরা প্রায় ৬০ ভাগ যা ১৯৯১-৯২ অর্থবছরে কমে দাঁড়ায় শতকরা প্রায় ৩৭ ভাগে। ২০১৪-১৫ অর্থবছরে দেশের জিডিপিতে সমন্বিত কৃষিখাতের অবদান ধরা হয় শতকরা ১৫.৯৬ ভাগ। অর্থাৎ পূর্বের তুলনায় বর্তমানে দেশের অভ্যন্তরীণ উৎপাদনে কৃষিখাতের অবদান অনেক কমে এসেছে। দেশে শিল্প, সেবা ও ব্যবসা ক্রমেই উন্নত হওয়ায় এমনটি হয়েছে। জিডিপিতে কৃষির উপখতগুলোর অবদানের ক্ষেত্রে যথেষ্ট তারতম্য দেখা যায়। উপখাত গুলোর মধ্যে শস্য ও শাক-সবজি উপখাতের অবদান সবচেয়ে বেশি। তারপর রয়েছে প্রাণিসম্পদ ও বনজসম্পদ উপখাত;সার্বিক বিবেচনায় মৎস্য খাতের অবদান প্রাণিসম্পদ ও বনজ সম্পদ উপখাত থেকে বেশি। নিচের সারনি ও লেখচিত্রে বিগত কয়েকবছরের জিডিপিতে মৎস্য খাতসহ কৃষির উপখাতগুলো দেখানো হলো:

২০০৫-০৬ সালের ভিত্তি মূল্যে জিডিপিতে মৎস্য খাতসহ কৃষির উপখাতসমূহের অবদানের হার (%)

মৎস্যখাতসহ কৃষির উপখাতসমূহ	২০১০-১১	২০১১-১২	২০১২-১৩	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫
ক.শস্য ও শাক-সবজি	১১.৩২	১০.৮৬	১০.২৫	৯.১১	৮.৮৩
খ. প্রাণিসম্পদ	২.৫৮	২.৫১	২.৪৫	১.৭৮	১.৭৩
গ. বনজ সম্পদ	১.৬৯	১.৬৬	১.৬৩	১.৭৪	১.৭২
ঘ. মৎস্য সম্পদ	৪.৪৩	৪.৩৯	৪.৩৭	৩.৬৯	৩.৬৫

উৎস: বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা, ২০১৫।

শিক্ষার্থীর কাজ

১। বাংলাদেশের কৃষি কাঠামোর দুর্বল দিকগুলো উল্লেখ করুন এবং তা কিভাবে সমাধান করবেন ?
২। বাংলাদেশের কৃষির দুর্বল দিকগুলো আলোকপাত করুন এবং উন্নয়নে কি পরামর্শ দিবেন?
৩। বাংলাদেশের কৃষির উপখাত সমূহ বর্ণনা করুন।
৪। বাংলাদেশের জিডিপিতে মৎসখাত সহ কৃষির উপখাত গুলোর অবদান ব্যাখ্যা করুন।

সারসংক্ষেপ

- কৃষি বাংলাদেশের অর্থনীতির প্রধান কর্মকান্ড এবং চালিকাশক্তি। শ্রম শক্তির প্রায় অর্ধেক কর্মসংস্থান যোগান দেয় এবং কৃষি ভিত্তিক শিল্প প্রতিষ্ঠানের প্রধান কাঁচামাল সরবরাহ করে। কৃষি জনগনের খাদ্য পুষ্টি নিশ্চয়তা আয়ের সূযোগ সৃষ্টি এবং দারিদ্র্য হ্রাস করনের মত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোর সমাধানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।
- বাংলাদেশ কৃষি প্রধান হলেও কৃষি ব্যবস্থা অনুন্নত। বাংলাদেশে ৫০ শতাংশের অধিক কৃষক পরিবার ভূমিহীন। বাংলাদেশে মাথাপিছু গড় জমির পরিমান ২৫ শতাংশের মত। বাংলাদেশের কৃষিতে আধুনিক যন্ত্রপাতির পরিবর্তে শ্রম নিবিড় প্রযুক্তি ব্যবহৃত হয়।কৃষিতে ছদ্মবেশী বেকারত্ব ক্রমান্বয়ে বেড়ে যাচ্ছে।
- বাংলাদেশের কৃষিখাত তিনটি প্রধান উপখাত নিয়ে গঠিত। এগুলো হল: ক)শস্য ও শাক-সবজি, খ)প্রাণি সম্পদ ও গ) বনজ সম্পদ। কিন্তু সার্বিক কৃষিখাতের মধ্যে মৎস্য সম্পদকে একটি উপখাত হিসেবে গণ্য করা হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ২.১

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। আয়তন অনুযায়ী বাংলাদেশের কৃষিখামার গুলোকে কত ভাগে ভাগ করা হয়েছে?
ক) তিন খ) চার গ) পাঁচ ঘ) ছয়

২। ২০১৪-১৫ অর্থবছরে বাংলাদেশের দেশজ উৎপাদনে মৎস্যসহ কৃষিখাতের অবদান কত শতাংশ ছিল?
ক) ১৪ খ) ১৫ গ) ১৬ ঘ) ১৭

৩। বাংলাদেশে মাথাপিছু গড় জমির পরিমান কত শতাংশের মত?
ক) ২০ খ) ২৫ গ) ৩০ ঘ) ৩৫

৪। বাংলাদেশের কত শতাংশের অধিক কৃষক পরিবার ভূমিহীন?
ক) ৪০ খ) ৪৫ গ) ৫০ ঘ) ৫৫

৫। বাংলাদেশের মোট দেশজ উৎপাদনের শতকরা কত ভাগ শস্য ও শাক-সবজি উপখাতের সৃষ্টি?
ক) ১১.২৭% খ) ১২.২৭% গ) ১৩.২৭% ঘ) ১৪.২৭%

৬। বাংলাদেশের মোট ভূখন্ডের শতকরা কত ভাগ জুড়ে বন রয়েছে?
ক) ১৫ খ) ১৬ গ) ১৭ ঘ) ১৮

৭। নিচের কোনটি বাংলাদেশের কৃষির কাঠামো নয়?
ক) জীবন ধারণ উপযোগী চাষাবাদ খ) অনুন্নত চাষ পদ্ধতি
গ) কৃষির পূর্ণ আত্তীকরণ ঘ) ক্ষুদ্র খামারের আয়তন

৮। নিচের কোনটি বাংলাদেশের কৃষির বৈশিষ্ট্য নয়?
ক) ভূমিহীন কৃষক খ) অনাবাদী জমি
গ) মাথাপিছু জমির পরিমান কম ঘ) দক্ষ কৃষি শ্রমিক

৯। নিচের কোনটি বাংলাদেশের কৃষির উপখাত নয়?
ক) শাক ও শাক-সবজি খ) যন্ত্রপাতি গ) প্রাণিজ সম্পদ ঘ) বনজ সম্পদ

পাঠ ২.২ কৃষি খামার ও কৃষিজোত
Agricultural Farm and Agricultural Land

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা-

- বাংলাদেশের কৃষিখামার বর্ণনা করতে পারবেন;
- বাংলাদেশের কৃষিজোতের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে পারবেন।

মূলপাঠ

ভূমিকা

কৃষি খামার ও কৃষিজোত ধারণা দুটি খুবই কাছাকাছি অর্থে ব্যবহৃত হয় এবং উভয়ের মধ্যে একটা সুক্ষ পার্থক্য রয়েছে। আবাদযোগ্য বা চাষাবাদের উপযোগী কোনো কৃষক বা সংগঠনের যে কোন আকৃতির জমিকে কৃষিজোত এবং উক্ত কৃষিজোতে উৎপাদনকার্য শুরু হলে তাকে কৃষিখামার বলা হয়। নিম্নে বিস্তারিত বর্ণনা করা হলো।

বাংলাদেশের কৃষি খামারঃ

একজন কৃষক যে জমির উপর কৃষি কাজ পরিচালোনা করে তা একই স্থানে বা মাঠের বিভিন্ন স্থানে থাকতে পারে। এরকম সব জমিকে একত্রে কল্পনা করে সে উৎপাদন বিষয়ে চিন্তা ভাবনা করে। সে তার আওতাধীন জমিতে কী কী শস্য, কী পরিমাণে এবং কোন পদ্ধতিতে উৎপাদন করবে সে সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহন করে। এরকম সিদ্ধান্ত গ্রহনকারী একককে কৃষি খামার বলে।

কৃষিখামারের প্রকারভেদ

বিভিন্ন দৃষ্টিকোন থেকে কৃষিখামারের শ্রেণিবিভাগ করা যায়। যেমনঃ

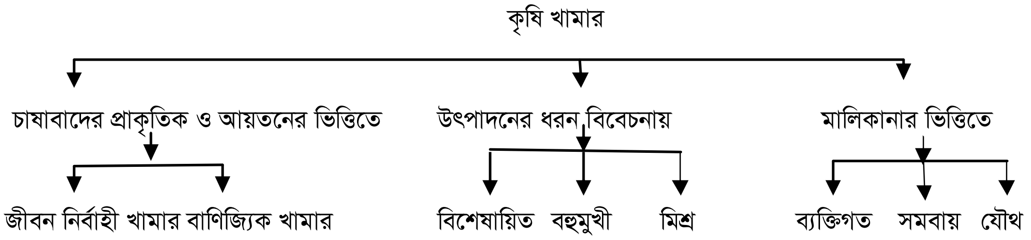

১। চাষাবাদের উদ্দেশ্যকে বিবেচনায় নিলে কৃষি খামারকে দুভাগে ভাগ করা যায়; যথা–– জীবন ধারণোপযোগী খামার এবং বাণিজ্যিক খামার।

i.) **জীবন ধারণোপযোগী খামার :** যে খামারে পারিবারিক শ্রম ব্যবহার করে পরিবারের ভরণ-পোষণের জন্য প্রয়োজনীয় বিভিন্ন কৃষিপণ্য উৎপাদন করা হয় তাকে জীবন ধারণোপযোগী খামার বলে। এরূপ খামারে উৎপাদিত পন্যের সামান্যই উদ্বৃত্ত থাকতে পারে। বাংলাদেশের অধিকাংশ খামারই এধরনের খামার।

ii) **বানিজ্যিক খামারঃ** যে খামারে মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে কৃষিপণ্য উৎপাদন করা হয় তাকে বাণিজ্যিক খামার বলে। এখানে কৃষক নিজস্ব ও ভাড়াটিয়া শ্রম এবং অধিক মূলধণ ব্যবহার করে।

২। ফসল উৎপাদনের ধরন অনুযায়ী খামারকে দুভাগে ভাগ করা যায়; যথা : বিশেষায়িত খামার ও বহুমুখী খামার।

i.) **বিশেষায়িত খামার:** যে খামারে মোট উৎপাদনের কমপক্ষে শতকরা ৪০ ভাগ কোনো একটি বিশেষ ফসল থেকে আসে তাকে বিশেষায়িত খামার বলে।

ii) **বহুমুখী খামার:** যে খামারে একাধিক কৃষি পণ্য যেমন ধান, গম, ভুট্টা, ইত্যাদি) উৎপাদন করা হয় তাকে বহুমুখী খামার বলে। এ খামার পরিবারের ভরণ-পোষণ এবং মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে পরিচালিত হয়।

৩। মালিকাণার ভিত্তিতে খামারকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়; যথা- ব্যক্তি মালিকানাধীন, সমবায় ও যৌথ খামার।

i.) **ব্যক্তি মালিকানাধীন খামার:** যে খামার সম্পূর্ণ রূপে ব্যক্তি মালিকানা ও তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হয় তাকে ব্যক্তি মালিকানাধীন খামার বলে। এরকম খামার কেবল জীবনধারনের জন্য কিংবা বানিজ্যিক ভিত্তিতে পরিচালিত হয়। বাংলাদেশে প্রায় সব খামারই ব্যক্তি মালিকাণাধীন।

ii) **সমবায় খামার:** একই এলাকার ক্ষুদ্র কৃষকেরা পারস্পরিক কল্যাণার্থে স্বেচ্ছায় সমমর্যাদার ভিত্তিতে নিজেদের জমি, শ্রম ও মূলধন একত্রিত করে সম্মিলিতভাবে চাষাবাদ করলে তাকে সমবায় খামার বলে। এ ক্ষেত্রে উৎপাদিত ফসল জমি ও প্রদত্ত যাবতীয় উপকরন অনুসারে অংশগ্রহনকারী কৃষকদের মধ্যে বন্টন করা হয়।

iii) **যৌথ খামার:** যে খামারের কৃষকেরা উৎপাদনের সকল উপকরণের মালিকানাস্বত্ত ত্যাগ করে তা রাষ্ট্রের উপর অর্পন করে এবং সেখানে তারা সকলে মিলে চাষাবাদ করে তাকে যৌথ খামার বলে।এক্ষেত্রে কৃষকরা উৎপাদিত ফসলের একটি নির্দিষ্ট অংশ যৌথ ভাবে ভোগ করে। এ খামার ব্যবস্থা সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোতে দেখা যায়। বাংলাদেশের বিদ্যমান আর্থ-সামাজিক অবস্থা ও রাজনৈতিক কাঠামোর প্রেক্ষিতে এ রকম কৃষিকাজ পরিচালনা করে খামার গড়ে তোলা সম্ভব নয়।

আদর্শ খামার বলতে বোঝায় যেখানে উৎপাদনের বিভিন্ন উপাদানের সুষ্ঠু প্রয়োগের ফলে একর প্রতি সার্বিক কৃষি ফসল হয় বা সর্বাধিক কৃষি ফলনের লক্ষ্যে চাষাবাদ করা হয়।

অর্থনীতিবিদ কিটিং এ প্রসঙ্গে বলেন, প্রচলিত প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে যে পরিমাণ জমিতে একটি ফার্মের একর প্রতি সর্বাধিক উৎপাদন পাওয়া যায় এবং উৎপাদিত ফসলের আয় হতে কৃষক ও তার পরিবার সন্তোষজনকভাবে জীবিকা নির্বাহ করে জীবনযাপনের সুযোগ পায়, সে পরিমান জমিকে আদর্শ খামার বা অর্থনৈতিক কৃষি জোত বলে।

কৃষিখামার বা কৃষি জোত প্রায় একই অর্থে ব্যবহার হয়। যেমন,যুক্তরাষ্ট্রের আদর্শ খামারের আয়তন ১৫০ একক,জার্মানিতে ২১ একর,বেলজিয়ামে ১৪ একর। বাংলাদেশে সাধারণত ৩ একর জমিকে আদর্শ খামার হিসেবে মূল্যায়ন করা হয়। সুতরাং বিভিন্ন দেশে আদর্শ খামারের আয়তন বিভিন্ন রকম। এমনকি একই দেশে বিভিন্ন স্থানে খামারের আয়তন বিভিন্ন হতে পারে।

আদর্শ খামারের নির্ধারকসমূহ (***Determination of an ideal Farm***):

আদর্শ খামার বা অর্থনৈতিক কৃষিজোত নিম্নোক্ত বিষয়ের উপর নির্ভর করে। যেমন:

ক. জমির আয়তন: জমির আয়তন অতি ক্ষুদ্র বা ক্ষুদ্র হলে আদর্শ খামার তৈরি করা যায় না।

খ. জমির প্রকৃতি: জমির উর্বরা শক্তি, শস্য বহুমুখীকরণের সুযোগ বিদ্যমান থাকলে আদর্শ খামারের জন্য জমি কিছুটা ছোট হলেও চলে। কিন্তু জমিতে শস্য বহুমুখীকরণ সম্ভব না হলে এবং উর্বরা শক্তি কম হলে আদর্শ খামার করার জন্য বড় জমির প্রয়োজন হয়।

গ. ফসলের প্রকৃতি: ফসলের প্রকৃতির উপরও এটি নির্ভরশীল। শাক-সবজি ক্ষেত্রে ক্ষুদ্রায়তনের জমি এবং গম, পাট প্রভৃতির ক্ষেত্রে তুলনামূলক বৃহৎ আয়তনের জমির প্রয়োজন হয়।

ঘ. প্রযুক্তি: আদর্শ খামার গঠন পদ্ধতি, যান্ত্রিকচাষাবাদ, ট্রাক্টর ইত্যাদির ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়।

ঙ. জলবায়ু: অনুকূল জলবায়ুতে ক্ষুদ্রায়তনের জমিতে এবং প্রতিকূল জলবায়ুতে বৃহৎ আয়তনের জমিতে খামার নির্মাণ করা যায়।

বাংলাদেশে কৃষি খামারের স্বরূপ

বাংলাদেশে কৃষি উৎপাদনের অদক্ষতা এবং স্বল্প উৎপাদনের জন্য বেশিরভাগ ক্ষেত্রে মান্ধাতার আমলের কলাকৌশলই দায়ী। কিন্তু অনেকেই মনে করেন, খামারের আয়তনও কৃষি উৎপাদনের অদক্ষতার জন্য অনেকাংশেই দায়ী।

জরিপ: ১৯৬৯-৭০ সালে বি আই ডি এস তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে (বর্তমানে বাংলাদেশ) কৃষিখামারের আয়তন সম্পর্কে একটি জরিপ চালায়। এ জরিপ কাজ ময়মনসিংহ জেলার ফুলপুর; ঠাকুরগাও; নারায়নগঞ্জ এলাকায় নানা জমিতে পানি সেচের সুবিধার উপর চালোনো হয়। বর্তমানে বাংলাদেশের প্রায় ৭৫ % ভূমি যা কৃষক নিজেই নিজের জমি চাষ করে, ২৫% জমি বর্গাচাষের অধীন ৪০% কৃষক পরিবার বর্গাচাষি এবং ৪৮% কৃষক পরিবার ভূমিহীন। মোট কৃষিজোতের শতকরা প্রায় ৮৮.৪৯ ভাগই ক্ষুদ্রায়তনের (০.৫-২.৪৯ একর), মাঝারি আয়তনের জোত প্রায় ১০.৩৪ ভাগ (২.৫০-৭.৪৯ একর) বৃহদায়তনের জোত ১.১৭ ভাগ(৭.৫০ একর)।

বাংলাদেশের কৃষি জোত

বাংলাদেশে বেশির ভাগ কৃষি জোতই ক্ষুদ্রায়তনের; মোট কৃষি জোতের শতকরা প্রায় ৮৮.৪৭ ভাগই ক্ষুদ্র জোত যার গড় আয়তন ১.২৯ একর। মাঝারি আয়তনের জোত মোট জোতের শতকরা প্রায় ১০.৩৪ ভাগ যাদের গড় আয়তন প্রায় ৪.৩২ একর। দেশে বৃহৎ জোতের অস্বিত্ব নগন্য যাদের গড় আয়তন প্রায় ১২.৭৪ একর। নিচে বাংলাদেশে কৃষি জোতের আয়তন ও মোট জোতের শতকরা হারের একটি সারণি দেওয়া হলে।

	মোট জোতের শতকরা	জোতের গড় আয়তন (একরে)
ক্ষুদ্রায়তনের জোত	৮৮.৪৯	১.২৯
০.৫০-০.৯৯ একর	৬৩.৫৫	০.৯৭
১.০০-১.৪৯ একর	১৩.৯৯	১.৫০
১.৫০-০২.৪৯ একর	১২.৩১	২.২৬
মাঝারি আয়তনের জোত		
২.৫০-৭.৪৯ একর	১০.৩৪	৪.৩২
বৃহদায়তনের জোত		
৭.৫০ একর ও তদূর্ধ্ব	১.১৭	১২.৭৪

প্রদত্ত সারণিটি পর্যালোচনা করেও বলা যায়, এদেশে কৃষিজোত গুলোর সিংহভাগই অতিক্ষুদ্র আয়তনের এ ধরনের জোতের যান্ত্রিক পদ্ধতিতে চাষাবাদ করা যায় না। তাছাড়া এরকম জোত থেকে যে আয় হয় তা দিয়ে কৃষি পরিবারের ভরণ পোষণ করা কেবল কঠিনই নয়, অনেকটা অসম্ভবও বটে।

শিক্ষার্থীর কাজ

১। জীবন ধারণোপযোগী খামারে একজন কৃষক তার প্রয়োজনের জন্য যে সব পণ্য উৎপাদন করতে পারে তার একটি তালিকা প্রস্তুত করুন।

২। জীবন ধারণোপযোগী খামার ও বাণিজ্যিক খামারের মধ্যে পার্থক্য দেখান?

সারসংক্ষেপ

- কৃষি খামার কৃষি খাতের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। তাই কৃষি খামারের প্রকারভেদ এবং আদর্শ কৃষি খামার সম্পর্কে ধারণা থাকা জরুরি।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ২.২

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। মালিকানা ভিত্তিতে খামারকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়। নিচের কোন খামারটি এ গ্রুপের অন্তর্ভূক্ত নয়?

ক) ব্যক্তি মালিকানাধীন খামার খ) সমবায় খামার
গ) বাণিজ্যিক খামার ঘ) যৌথ খামার

২। বাংলাদেশের কৃষিজোতকে আয়তন হিসেবে তিন ভাগে ভাগ করা যায়। নিচের কোনটি অবিবেচিত?

ক) ক্ষুদ্রায়তনের জোত খ) স্বল্প আয়তনের জোত
গ) মাঝারি আয়তনের জোত ঘ) বৃহদায়তনের জোত

পাঠ ২.৩ কৃষিপণ্যের বিপণন ও সমস্যা
Marketing of Agricultural Products and Problems

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা-

- বাংলাদেশে কৃষি পণ্য বিপননে সমস্যাসমূহ চিহ্নিত করতে পারবেন;
- কৃষি পণ্য বিপনণ সমস্যা সমাধানে সরকার/রাষ্ট্রের অংশগ্রহনের গুরুত্ব বিশ্লেষণ করতে পারবেন।

মূলপাঠ

বাংলাদেশে কৃষি পণ্য বিপণনে সমস্যাসমূহ

যে সব প্রক্রিয়ার মাধ্যমে উৎপাদিত পণ্য উৎপাদকের কাছ থেকে ভোক্তাদের কাছে পৌছায় তাকে বিপণন বলে। এ অর্থে কৃষিপণ্যের বিপণন তথা বাজারজাতকরণ হলো এমন একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে উৎপাদিত কৃষি পণ্য উৎপাদন কারীদের কাছ থেকে চূড়ান্ত ভোক্তাদের কাছে পৌছানো হয়। এ প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন কর্মস্তর অতিক্রম করতে হয়। এগুলো হলো উৎপাদন শেষে পণ্য সংগ্রহ ও একত্রিকরণ, পণ্যের শ্রেণিবিভাগ ও নমুনাকরণ, প্যাকিং, গুদামজাতকরণ, মালিকানা বদল,পরিবহন অর্থসংস্থান,ঝুঁকিবহন, বিজ্ঞাপন প্রদান, বাজার সংক্রান্ত তথ্যাদি সংগ্রহ, বন্টন, বিক্রয় ইত্যাদি। এগুলো সুষ্টভাবে সম্পাদিত হলে কৃষকরা পন্যের উপযুক্ত দাম পায় এবং ভোক্তা সাধারণও তা যথার্থ দামে ক্রয় করতে পারে।

বাংলাদেশ একটি কৃষি নির্ভর উন্নয়নশীল দেশ। বাংলাদেশে কৃষিপন্যের বাজার ব্যবস্থার নিজস্ব কতিপয় বৈশিষ্ট রয়েছে। এবং বাংলাদেশে কৃষিজাত পণ্যের বিক্রয় ব্যবস্থায় নিম্নে উল্লেখিত সমস্যা গুলো দেখা যায়:

১. **বাজারের অবস্থা সম্পর্কে অভিজ্ঞতা:** বাংলাদেশের মত উন্নয়নশীল দেশের অধিকাংশ কৃষক বাজার সম্বন্ধে বিশেষ কোন খোজ-খবর রাখে না। বিভিন্ন কৃষি পণ্যের মূল্যের ভবিষ্যৎ গতি সম্বন্ধেও তারা ওয়াকিবহাল নয়। সুতরাং তাদের অজ্ঞতার জন্য মধ্যবর্তি ব্যবসায়ীগন অতিসহজেই কৃষকদেরকে ন্যায্যমূল্য থেকে বঞ্চিত করতে পারে।

২. **দামের তীব্র উঠানামা:** কৃষি পণ্যের দামের তীব্র উঠানামা ঘটে। ফসলের মৌসুমে দাম একেবারেই কম থাকে এবং মৌসুম শেষ হওয়ার পর দাম আবার বেশ বেড়ে যায়। কিন্তু যখন দাম বাড়ে তখন কৃষকের ঘরে আর কোন বিক্রয়যোগ্য উদ্বৃত্ত থাকে না। সুতরাং দামের এরূপ তীব্র উঠানামার ফলে আমাদের কৃষক ক্ষতিগ্রস্থ হয়।

৩. **গুদামের অভাব:** অধিকাংশ উন্নয়শীলদেশের গ্রামাঞ্চলে কৃষি পণ্য সংরক্ষনের জন্য প্রয়োজনীয় গুদামের একান্ত অভাব রয়েছে। ফলে কৃষক সম্প্রদায় অধিক দাম পাওয়ার আশায় কৃষি পণ্য গুদামজাত করে রাখতে পারে না। তারা ফসলের মৌসুমে ফসল কম দামে বিক্রয় করে দিতে বাধ্য হয়।

৪. **শ্রেণীবিভাগ ও নমুনাকরণের অভাব:** স্বল্পোন্নত দেশসমুহে কৃষিপণ্য শ্রেণিবিভাগ ও নমুনাকরণের সুবন্দোবস্ত নেই। পণ্যের গুনাগুনের উপর এর দাম নির্ভর করে। কিন্তু এ সমস্ত দেশে পণ্যের গুণানুসারে তাদের শ্রেনিবিভাগ করা হয়না ফলে এখানে উৎকৃষ্ট ও নিকৃষ্ট পণ্য একই দামে বিক্রয় হয়। ফলে কৃষকরাও উৎকৃষ্ট পণ্যের জন্য ভালো দাম পায় না।

৫. **কৃষকের দারিদ্র্য:** দারিদ্র্যের জন্য কৃষক তার উৎপাদিত পণ্য অধিক দাম পাওয়ার আশায় বেশি দিন ধরে রাখতে পারে না। ফলে ফসল উঠার সঙ্গে সঙ্গে কৃষক তার ফসল নাম মাত্র দামে বিক্রি করে দিতে বাধ্য হয়। আড়তদারগণ নামমাত্র মূল্যে এসব দ্রব্য খরিদ করে এবং পরে উচ্চ মূল্যে তা বিক্রয় করে প্রচুর মুনাফা অর্জন করে।

৬. **পরিবহন ব্যবস্থার অভাব:** বাংলাদেশের মতো আরো অনেক দেশে পরিবহন ব্যবস্থার অভাবে কৃষক কৃষি পণ্য দূরবর্তী বাজারে নিয়ে যেতে পারে না। ফলে নিকটবর্তি হাটবাজারে তারা কম দামে পণ্য বিক্রয় করতে বাধ্য হয়।

৭. **দালালের প্রভাব :** সাধারণত কৃষক তাদের পণ্য সরাসরি প্রকৃত ক্রেতাদের নিকট বিক্রয় করতে পারে না। প্রকৃত ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে একদল দালালশ্রেনীর লোক থাকে। মুনাফার প্রায় সবটুকু এ সমস্ত দালালদের হাতে চলে যায়।

৮. **অশিক্ষা:** বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশ সমূহের অধিকাংশ কৃষক অশিক্ষিত ফলে তারা ফটকা কারবারের জটিলতা ও বৈদেশিক বাজারের গতি-প্রকৃতির সঙ্গে একেবারেই অপরিচিত।

৯. **সংগঠিত বাজারের অভাব:** বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশের গ্রামাঞ্চলের হাট বাজার সুনিয়ন্ত্রিত বা সুসংগঠিত নয়। নিয়ন্ত্রনের অভাবে বাজারে কৃষকদের নিকট থেকে বিভিন্ন হারে খাজনা আদায় করা হয়। বাজারের চাঁদা, আড়তদারি প্রভৃত খাতে অর্থ প্রদান করার পর যে টাকা কৃষকের হাতে থাকে তা বস্তুত তার ফসলের ন্যায্যমূল্যের অর্ধাংশও নয়।

১০. **পণ্যের মান:** বিভিন্ন স্থানে উৎপাদিত কৃষি পণ্যের মান একরূপ নয়। ফলে কৃষি পণ্যের মান নিধারর্ণের বিষয়টি কৃষিবাজারে এক জটিল সমস্যার সৃষ্টি করে।

১১. **সুষ্ঠু সরকারি নীতির অভাব:** অধিকাংশ উন্নয়নশীল দেশে কৃষি পণ্যের বাজার সংগঠিত ও নিয়ন্ত্রিত করার জন্য সরকারের কোনরূপ সুস্পষ্ট নীতিমালা নেই। ফলে কৃষক কৃষি বাজারে রীতিমত অরাজকঅবস্থা বিরাজ করে।

১২. **প্রতিযোগীতার অভাব:** বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশে সুষ্ঠু যাতায়াত ব্যবস্থার অভাবে বাজার গুলো পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন। ফলে বিভিন্ন বাজারের মধ্যে প্রতিযোগীতার অভাব দেখা যায় এবং এক বাজারের সঙ্গে অন্য বাজারের দামের কোনরূপ সামঞ্জস্য থাকে না।

কৃষিপণ্যের বিপণন সমস্যা সমাধানে সরকারের ভূমিকা:

বাংলাদেশে কৃষি পণ্যের বিক্রয় ব্যবস্থা উন্নয়ন সাধনের উদ্দেশ্যে নিম্নোক্ত ব্যবস্থাগুলো গ্রহন করা যেতে পারে:

১. **বাজার নিয়ন্ত্রন:** বিভিন্ন বাজারে কৃষকদের নিকট থেকেই যাতে আড়তদারি,পাল্লাদারি,বিভিন্ন চাঁদা প্রভৃতি হতে অর্থ আদায় করতে না পারে সে জন্য আমাদের গ্রামঞ্চলে বাজারগুলোকে সুষ্টভাবে নিয়ন্ত্রন করা দরকার।

২. **যাতায়াত ব্যবস্থার উন্নতি:** দেশের যাতায়াত ব্যবস্থার উন্নতি সাধনের মাধ্যমে গ্রাম ও শহরে কৃষি পণ্যের বহন খরচ হ্রাস করা দরকার। এছাড়া রাস্তাঘাটের উন্নতি সাধনের মাধ্যমে গ্রামগুলোকে রেল স্টেশন ও স্টিমারের সাথে যুক্ত করতে হবে।

৩. **শ্রেণীবিভাগ ও নমুনাকরণ:** স্বল্পোন্নত দেশসমুহে কৃষিপণ্য শ্রেণিবিভাগ ও নমুনাকরণের সুবিধা আছে। পণ্যের গুনাগুনের উপর এর দাম নির্ভর করে। কিন্তু এ সমস্ত দেশে পণ্যের গুণানুসারে তাদের শ্রেনিবিভাগ করা হয়। ফলে এখানে উৎকৃষ্ট পণ্য ভালো দামে এবং নিকৃষ্ট পণ্য কম দামে বিক্রয় করতে পারবে। ফলে কৃষকও উৎকৃষ্ট পণ্যের জন্য ভালো দাম পাবে।

৪. **গুদাম নির্মাণ ও কৃষি পণ্য সংরক্ষণ:** গুদামজাতকরনের ব্যবস্থার অভাবে কৃষকরা যাতে ফসল ওঠার সঙ্গে সঙ্গে কম দামে তা বিক্রয় করে ফেলতে বাধ্য না হয় তার জন্য গ্রামে সমবায় সমিতি গঠন করে কৃষিপণ্য গুদামজাতকরণ ও সংরক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে।

৫. **দালাল ও ফড়িয়ার বিলোপ সাধন:** কৃষি পণ্যের বাজার থেকে দালাল ও মধ্যবর্তী ফড়িয়াদের বিলোপ সাধন করতে হবে। দালাল, ব্যাপারি, আড়তদার প্রমুখ মধ্যবর্তী ব্যবসায়ীগন কৃষকদের প্রাপ্য মূল্যে ভাগ বসিয়ে তাদেরকে সর্বস্বান্ত করে তোলে।

৬. **কৃষি ঋণ:** আর্থিক অনটনের ফলে আমাদের কৃষকের অধিক দাম পাওয়ার আশায় তাদের পণ্য সামগ্রী মজুত করে রাখতে পারে না। সুতরাং আর্থিক অনটনের জন্য কৃষক যাতে ফসলের মৌসুমেই পণ্য বিক্রয় করে দিতে বাধ্য না হয় সে জন্য উপযুক্ত কৃষি ঋণের ব্যবস্থা করতে হবে।

৭. **সর্বনিম্ন মূল্য ধার্যকরণ:** সরকার কর্তৃক কৃষিপণ্যের যে সর্বনিম্ন মূল্য ধার্য করা হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। কেউ নির্দিষ্ট মূল্যের কম দামে ক্রয় করলে তাদের কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে।

৮. **ক্রয় এজেন্সি:** ন্যায্য মূল্যে কৃষকদের নিকট থেকে ফসল ক্রয় করার উদ্দেশ্যে সরকারকে ক্রয় এজেন্সি গঠন করতে হবে। এ ধরনের ক্রয় এজেন্সির মাধ্যমে সরকার নির্ধারিত মূল্যে ফসল ক্রয় করলে অন্যরাও এ দামে ফসল ক্রয় করতে বাধ্য থাকবে।

৯. **সমবায় বাজার সমিতি গঠন:** বাংলাদেশের কৃষিপণ্যের বাজারে অসংখ্য কৃষক বিক্রেতার বিপরীতে ক্রেতা হিসেবে স্বল্প সংখ্যক ফড়িয়া ও বেপারি থাকে। ফলে বাজারে একধরনের ওলিগোপসনি বিরাজ করে। এতে দরকষাকষির ক্ষেত্রে কৃষকের অবস্থা দূর্বল হয়ে পড়ে ফলে তারা ফসলের ন্যায্যমূল্য পায় না। এমতাবস্তায় সমবায় সমিতি গঠনের মাধ্যমে বাজারে কৃষকদের অবস্থান শক্তিশালী করা দরকার।

১০. **আন্তর্জাতিক বাজারের সঙ্গে সংযুক্তি সাধন:** আমাদের কৃষি পণ্যের বিদেশে রপ্তানির সুযোগ সৃষ্টি করা প্রয়োজন। কিন্তু অনেক সময় দেশে খাদ্যশস্যের মজুদ কমে যাওয়ার আশংকায় খাদ্যশস্য রপ্তানি করা হয় না। এতে দেশে খাদ্য শস্যের মূল্য কম থাকে এবং কৃষক ক্ষতিগ্রস্থ হয়। অতএব দেশের কৃষিপণ্যের বাজারে উন্নতি সাধনের জন্য দেশীয় বাজার ও আন্তর্জাতিক বাজারের মধ্যে সংযুক্তি সাধন দরকার।

শিক্ষার্থীর কাজ

বাংলাদেশে কৃষিপণ্য বিপণনে সমস্যাসমূহ বর্ণনা করুন। কৃষিপণ্যের বিপণন সমস্যা সমাধানে সরকারের ভূমিকা বিশ্লেষণ করুন।

সারসংক্ষেপ

- কৃষি পণ্যের বিপণন সমস্যা বহুবিধ।
- কৃষি পণ্যের বিপণন সমস্যা সমাধানে সরকারি হস্তক্ষেপ অনস্বীকার্য।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ২.৩

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। নিচের কোনটি বাংলাদেশে কৃষি পণ্য বিপণনের সমস্যা নয়.

ক) সুষ্টু সরকারী নীতির অভাব
খ) কৃষি ঋণের স্বল্পতা
গ) দালালের প্রভাব
ঘ) সংগঠিত বাজার

২। নিচের কোনটি বাংলাদেশে কৃষি পণ্য বিপণনের সমস্যার সমাধান নয়?

ক) গুদাম নির্মাণ
খ) দালাল ও ফড়িয়া বিলোপ সাধন
গ) যাতায়াত ব্যবস্থার উন্নতি
ঘ) অনিয়ন্ত্রিত বাজার

পাঠ ২.৪ কৃষি খাতে পরিবর্তনের গতিধারা
Changing Dynamics in Agricultural Sector

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা-

- বাংলাদেশের কৃষিতে শস্য উৎপাদন, মৎস্য চাষ, গবাদি পশু ও হাঁসমুরগী প্রতিপালন, চিংড়ি ও মাশরুম চাষ বন ও নার্সারী স্থাপনে পরিবর্তনের গতিধারা বিশ্লেষণ করতে পারবেন।

মূলপাঠ

ভূমিকা

বাংলাদেশে বর্তমানে কৃষিতে ব্যাপক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। স্বাধীনতার পর কৃষি উৎপাদনযোগ্য ভূমির পরিমান বৃদ্ধি পায়নি। অথচ প্রতি মুহুর্তে বৃদ্ধি পাচ্ছে খাদ্যগ্রহনকারীর সংখ্যা। বিদ্যমান কৃষিভূমিতে বসতবাড়ি নির্মান ও নগরায়নের ফলে কৃষি উৎপাদনযোগ্য ভূমির পরিমান ব্যাপক ভাবে হ্রাস পাওয়া স্বত্তেও কৃষি উৎপাদনে বাংলাদেশের সফলতা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এ পরিবর্তন উৎপাদনের কলাকৌশল,উপকরনসমূহের প্রয়োগ,শস্য-উদ্ভিদ ও প্রানিজ সম্পদ পরিচর্যা, উৎপাদনের পরিমান ইত্যাদি ক্ষেত্রে বেশী লক্ষনীয়।

খাদ্যশস্য উৎপাদন:

ক) বর্তমানকালে বিভিন্ন শস্যের প্রচলিত বীজের পরিবর্তে উদ্ভাবিত নতুন নতুন জাতের উচ্চ ফলনশীল বীজের ব্যবহার এমন বাড়ছে। বিশেষ করে ধান উৎপাদনের ক্ষেত্রে তা বিশেষভাবে লক্ষনীয়। বর্তমানে প্রায় ৩৭টি উচ্চ ফলনশীল ধানের চাষ হচ্ছে।

খ) মানুষ ও পশুচালিত লাঙলের পরিবর্তে পাওয়ারটিলার, ভাড়ায় চালিত ট্রাক্টর বাহিত লাঙল,শস্য মাড়াই যন্ত্র ইত্যাদির ব্যবহার চলছে।

গ) গোবরের সারের পরিবর্তে বিভিন্ন ধরনের কৃত্রিম সার ও কীটনাশকের ব্যবহার উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে। বৃষ্টিপাতের পরিবর্তে যন্ত্রনির্ভর পানিসেচের ব্যবহার বৃদ্ধি পেয়েছে।

ঘ) শস্য বহুমুখীকরণও শস্য উৎপাদনে পরিবর্তনের ধারার আর একটি রূপ। আবার এক জমিতে এখন বছরে দুটি তিনটি শস্যের চাষ চলছে।

ঙ) কৃষক তার জমির আইলে ফলের গাছ লাগাচ্ছে, জমি পতিত না রেখে সেখানে বিভিন্ন ধরনের শাকসবজি চাষ করেছে। ফলে নিবিড় চাষের মাত্রা ও আওতা বাড়ছে।

চ) শস্য উৎপাদনের পরিমানেও এসেছে দারুন পরিবর্তন। যা নিচের সারণি থেকে লক্ষ্যনীয়।

বাংলাদেশের পরিসংখ্যান ব্যুরোর চূড়ান্ত হিসাব অনুযায়ী ২০১৩-১৪ অর্থবছরে খাদ্যশস্যের মোট উৎপাদন হয়েছিল ৩৮১.৭৪ লক্ষ মেট্রিক টন। তন্মধ্যে,আউশ ২৩.২৬ লক্ষ মেট্রিক টন, আমন ১৩০.২৩ লক্ষ মেট্রিক টন,বোরো ১৯০.০৭ লক্ষ মেট্রিক টন, গম ১৩.০২ লক্ষ মেট্রিক টন ও ভূট্টা ২৫.১৬ লক্ষ মেট্রিক টন। বাংলাদেশে পরিসংখ্যান ব্যুরোর সাময়িক হিসাব অনুযায়ী ২০১৪-১৫ অর্থবছরে আউশ ২৩.২৮ লক্ষ মেট্রিক টন, আমন ১৩১.৯০ লক্ষ মেট্রিক টন উৎপাদন হয়েছে এবং কৃষি মন্ত্রনালয়ের হিসাব অনুযায়ী এ অর্থবছরে ভূট্টা উৎপাদন হয়েছে ২৫.২১ লক্ষ মেট্রিক টন। বোরো ১৮৯.৭৭ লক্ষ মেট্রিক টন ও গম ১৩.৩৩ লক্ষ মেট্রিক টন হবে বলে আশা করা হচ্ছে।নিম্নের সারনিতে ২০০৬-০৭ অর্থবছর থেকে ২০১৪-১৫ অর্থবছর পর্যন্ত খাদ্যশস্য উৎপাদনের পরিসংখ্যান দেখানো হল।

১০	২০০৬-০৭	২০০৭-০৮	২০০৮-০৯	২০০৯--১০	২০১০-১১	২০১১-১২	২০১২-১৩	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫ লক্ষ্য মাত্রা
আউশ	১৫.১২	২২.৯৩	২১.০০	২২.১৮	২১.৩৩	২৩.৩৩	২১.২৮	২৩.২৬	২৩.২৮
আমন	১০৮.৪১	১১০.০৬	১২২.২৫	১২৬.৬০	১২৭.৯১	১২৭.৯৮	১২৮.৯৭	১৩০.২৩	১৩১.৯০
বোরো	১৫৯.৯০	১৮৬.৭৭	১৮২.৮৭	১৮৫.২৫	১৮৬.১৭	১৮৭.৫৯	১৮৭.৭৮	১৯০.০৭	১৮৯.৭৭
মোট চাউল	২৮৩.৪৩	৩১৯.৭৬	৩২৬.১২	৩৩৪.০৩	৩৩৫.৪১	৩৩৮.৯০	৩৩৮.৩৩	৩৪৩.৫৬	৩৪৪.৯৫
গম	৭.২৫	৯.৫৬	৯.৫৮	১০.৩৯	৯.৭২	৯.৯৫	১২.৫৫	১৩.০২	১৩.৩৩
ভূট্টা	৮.৯৯	২৩.৬১	১১.৩৭	১৩.৭০	১৫.৫২	১৯.৫৪	২১.৭৮	২৫.১৬	২৫.২১
মোট	২৯৯.৬৭	৩৫২.৯৩	৩৪৭.০৭	৩৫৮.১২	৩৬০.৬৫	৩৬৮.৩৯	৩৭২.৬৬	৩৮১.৭৪	৩৮৩.৪৯

উৎস: বাংলাশে অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০১৫

গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগি প্রতিপালনে পরিবর্তনের ধারা

আবহমানকাল থেকেই এদেশের গ্রামাঞ্চলের প্রায় প্রতিটি পরিবারই গবাদিপশু যেমন গরু, মহিষ, ছাগল ইত্যাদি ও হাঁস-মুরগি পালন করে আসছে । পূর্বে কেবল চাষাবাদ ও পরিবারের প্রয়োজন মেটানোর জন্য তা করা হলেও বর্তমানে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে তা বানিজ্যিকভাবে পরিচালিত কিংবা কর্মসংস্থানের উপায় হিসেবে বেছে নেয়া হচ্ছে। এখন বাংলাদেশের অনেক জায়গাতেই ছোট বড় পশু খামার রয়েছে। দেশে এখন বহু হাঁস-মুরগির খামার হচ্ছে। এসব খামারে পুরাতন প্রজাতির পশু-পাখির পরিবর্তে নতুন নতুন প্রজাতির পশু-পাখি বেছে নেওয়া হচ্ছে। এক্ষেত্রে বেশি মাংস, দুধ ও ডিম পাওয়া যায় এমন প্রজাতির পশু-পাখি পালন করা হচ্ছে। এ প্রসঙ্গে খাকি কেম্বেল ও জিনডিং হাঁস-মুরগি পালন একটি লাভজনক ও সম্ভাবনাময় পেশা হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে।

পূর্বে এদেশে পশু- পাখি পালনে সরকারের তেমন সংশ্লিষ্টতা না থাকলেও এখন এ ব্যপারে সরকার যথেষ্ট সক্রিয় রয়েছে। বর্তমানে পশু -পাখি পালনে বেকার যুবক-যুবতিদেরকে প্রশিক্ষণ প্রদান ও স্বল্প সুদে ঋণ প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এছাড়াও গবাদি পশু ও হাঁস-মুরগির টিকা উৎপাদন ও ভর্তুকিপ্রদত্ত দামে তা সরবরাহ, কম দামে হাঁস-মুরগির বাচ্চা বিক্রি, জাত উন্নয়নের জন্য কৃত্রিম প্রজনন কার্যক্রম, এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা প্রতিরোধমূলক কার্যক্রম গ্রহন, একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্প ইত্যাদির মাধ্যমে সরকার খাতের উন্নয়নে ব্যপক উদ্যোগ গ্রহন করেছে। দেশে সাম্প্রতিক কালে গবাদি পশু ও হাঁস-মুরগি প্রতিপালনে যে পরিবর্তন সূচিত হয়েছে এ খাতের উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে তার প্রতিফলন ঘটছে। নিচের সারণিতে বিগত কয়েক বছরে এ খাতে উৎপাদনের একটি হিসাব দেওয়া হলো:

সারণিতে গবাদি পশু ও হাঁস মুরগির উৎপাদন (লক্ষ)

	২০০৫-০৬	২০০৮-০৯	২০১৩-১৪
মোট গবাদি পশু	৪৬৪.৭	৪৯৫.৫৮	৫৩৬.৬০
মোট হাঁস-মুরগি	২৩২৯.৯	২৬২৬.২৮	৩০৭৪.৬৮

মৎস্য উৎপাদন

চলতি অর্থবছরে মোট দেশজ উৎপাদনের প্রায় ৩.৬৯ শতাংশ মৎস্য খাতের অবদান। দেশের মোট কৃষিজ আয়ের ২২.৬০ শতাংশ মৎস্য খাত থেকে আসে। দেশের রপ্তানি আয়ের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ আসে মৎস্য খাত থেকে। আমাদের দৈনন্দিন খাদ্যে প্রানিজ আমিষের প্রায় ৬০ শতাংশ যোগান দেয় মাছ। মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে প্রাণিজ আমিষ সরবরাহ বৃদ্ধি করা এ খাতের একটি অন্যতম লক্ষ্য। এ লক্ষ্যকে সামনে রেখে সরকার কর্তৃক বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহন ও বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম হচ্ছে-সমাজ ভিত্তিক মৎস্য চাষ কার্যক্রম সম্প্রসারণ ও জোরদারকরণ, খাস জলাশয়ে মৎস্যজীবিদের প্রবেশাধিকার নিশ্চিতকরণ, বিল নার্সারি কার্যক্রম গ্রহন ও মুক্ত জলাশয়ে মাছের পোনা

অবমুক্তকরণ,মৎস্য অভায়শ্রম সৃষ্টি,ঘের ও খাচায় মাছ চাষ কার্যক্রম সম্প্রসারণ, ভরাট হয়ে যাওয়া নদী পূনঃখনন করে মাছের আবাসস্থল পুনরুদ্ধার এবং গবেষনার মাধ্যমে উন্নত প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও সম্প্রসারণ। মৎস্য অধিদপ্তর মানব উন্নয়নের লক্ষ্যে মৎস্য/চিংড়ি চাষি ও মৎস্যজীবিদের নিয়মিতভাবে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষনের ব্যবস্থা করে থাকে। এছাড়াও মুক্ত জলাশয়ে মৎস্য সম্পদ ব্যবস্থাপণার মাধ্যমে দেশের দরিদ্র মৎস্যচাষি ও মৎস্যজীবিদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়ন করেছে।

২০১৩-১৪ অর্থবছরে দেশে মোট মৎস্য উৎপাদনের পরিমান ছিল ৩৫.৪৮ লক্ষ মেট্রিক টন। ২০১৪-১৫ অর্থবছরে মৎস্য উৎপাদনে লক্ষ্যমাত্রা ৩৭.০৩ লক্ষ মেট্রিক টন। নিম্নে সারণীতে ২০০৭-০৮ থেকে ২০১৪-১৫ অর্থবছর পর্যন্ত বিভিন্ন উৎসে মৎস্য উৎপাদন পরিসংখ্যান দেখানো হল।

মৎস্য খাতের বিভিন্ন উৎস হতে মাছের উৎপাদন

খাত	আয়তন হেক্টর	২০০৭-০৮	২০০৮-০৯	২০০৯-১০	২০১০-১১	২০১১-১২	২০১২-১৩	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫ লক্ষ্য মাত্রা
১.অভ্যন্তরীণ:									
(ক) মুক্তজলাশয়									
নদী ও মোহনা	৮.৫৪	১.৩৭	১.৬৯	১.৮২	১.৪৫	১.৪৬	১.৪৭	১.৬৭	১.৬৯
সুন্দরবন	১.৭৮	০.১৮	০.২০	০.০৮	০.২২	০.২২	০.২২	০.১৭	০.১৮
বিল	১.১৪	০.৭৮	০.৯৩	১.২৭	০.৮২	০.৮৫	০.৮৯	০.৮৯	০.৯৩
কাপ্তাই হ্রদ	০.৬৯	০.০৮	০.০৯	০.০৭	০.০৯	০.০৮	০.০৯	০.০৮	০.০৯
প্লাবনভূমি	২৮.১০	৮.১৯	৬.১৭	৭.০৫	৭.৯৭	৬.৯৬	৬.৮৬	৭.১৪	৭.১৫
উপ-মোট (মুক্তজলাশয়)	৪০.২৫	১০.৬০	৯.০৮	১০.৭৫	১০.৫৫	৯.৫৭	৯.৬১	৯.৯৫	১০.০৪
খ) চাষকৃত									
পুকুর	৩.৩৮	৮.৬৬	১০.২৭	১১.৩৯	১২.২০	১৩.৯২	১৪.৭৯	১৫.২৭	১৫.৯৫
বাওড়	০.০৫	০.০৫	০.০৬	০.০৯	০.৫১২	০.০৫২	০.০৬	১.৯৩	২.২৫
অর্ধ আবদ্ধ	১.২২	-	-	০.৪৬	০.০৪৯	১.৩২	১.৩৯	০.০৭	০.০৭
চিংড়ি খামার	২.৭৫	১.৩৫	১.৪৯	১.৫৬	১.৮৫	১.৯৬	২.০৪	২.১৬	২.২৭
পেন কালচার	-	-	-	-	-	-	-	০.১৩	০.১৪
কেজ কালচার	-	-	-	-	-	-	-	০.০১	০.০২
উপমোট(চাষকৃত)	৭.৪১	১০.০৬	১১.৮২	১৪.২৬	১৪.৬০	১৭.২৬	১৮.৬০	১৯.৫৬	২০.৭০
মোট অভ্যন্তরীণ	৪৭.৬৬	২০.৬৬	২০.৯০	২৪.০২	২৫.১৫	২৬.৮৩	২৮.৮১	২৯.৫১	৩০.৭৪
২. সামুদ্রিক:									
ক) ইন্ডাষ্ট্রিয়াল		০.৩৪	০.৪৮	০.৩৪	০.৭৩	০.৭৭	০.৭৭	০.৭৭	০.৭৭
খ) আর্টিসেন্যাল		৪.৬৩	৫.৬৩	৪.৮৩	৫.১৬	৫.১৯	৫.১৯	৫.৫১	৫.৫১
মোট (সামুদ্রিক)	-	৪.৯৭	৬.১১	৫.১৭	৫.৭৮	৫.৮৯	৫.৯৬	৬.২৮	৬.২৮
সর্বমোট	-	২৫.৬৩	২৭.০১	২৮.৯৯	৩০.৬২	৩২.৬২	৩৪.১০	৩৫.৪৭	৩৭.০৩

উৎস বাংলাশে অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০১৫

মাছের রেনু ও পোনা উৎপাদন

মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধির প্রধান শর্তই গুণগত মানসম্পন্ন পোনার সহজলভ্যতা। পরিবেশ ও মনুষ্যসৃষ্টি বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতা যেমন অপরিকল্পিত ভাবে নির্মিত বন্যা নিয়ন্ত্রন বাধ,শস্য ক্ষেতে কীটনাশকের অপরিমিত ও অবাধ ব্যবহার, পাণি দূষণ ইত্যাদি নানাবিধ কারণে প্রাকৃতিক উৎসে রেনু উৎপাদনসহ পোনা উৎপাদন ও আহরণ ক্রমান্বয়ে হ্রাস পাচ্ছে। বিভিন্ন কারণে ক্ষতিগ্রস্থ প্রাকৃতিক প্রজণন ক্ষেত্রসমূহের পূনরুদ্ধারের জন্য সরকার বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহন করেছে। বর্তমানে

হেচারিগুলোতে রেনু উৎপাদনে অন্তঃপ্রজনন সমস্যা নিরসনে মৎস্য অধিদপ্তর ৩২ টি সরকারি খামারের অবকাঠামোগত উন্নয়ন এবং প্রাকৃতিক উৎস হতে পোনা সংগ্রহের পর তা যথাযথভাবে পালন করে গুণগতমান সম্পূর্ণ ব্রুড মাছ উৎপাদন করছে। এতে পোনার গুণগত মান নিশ্চিত হচ্ছে। বর্ধিত পোনার চাহিদা পূরণের জন্য বর্তমানে দেশে ১৩৬ টি সরকারি মৎস্য বীজ উৎপাদনে খামারের পাশাপাশি বেসরাকারি উদ্যোগে ৮৯৩ টি হ্যাচারি পরিচালিত হচ্ছে। সারণিতে ২-এ গত কয়েক বছরের সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে মৎস্য হ্যাচারি তে উৎপাদিত রেণু/পোনা উৎপাদন পরিসংখ্যান দেয়া হল।

মৎস্য হ্যাচারি তে উৎপাদিত রেণু/ পোণা উৎপাদন

সাল	হ্যাচারির সংখ্যা		রেণু(মেট্রিক টন)			উৎপাদিত পোনার সংখ্যা (কোটি)		
	সরকারি	বেসরকারি	সরকারি	বেসরকারি	মোট	সরকারি	বেসরকারি	মোট
২০০৭	১১৩	৮৬০	৬.২৪	৪৫৭.২৯	৪৬৩.৬৫	২.০৩	৬২২.১৩	৬২৪.১৬
২০০৮	১১৩	৮৭৩	৬.৪০	৪১৬.৯৫	৪২৪.৩৫	২.৭৬	৫৪৯.০৪	৫৫১.৮০
২০০৯	১১৫	৮৮০	৪.৫২	৪৫৮.১৮	৪৬২.৭০	১.৬৬	৯৬০.০১	৯৬১.৬৭
২০১০	১২০	৮৬২	৫.৫৯	৪৬০.২০	৪৬৫.৭৯	২.১১	৯৮৩.৮৭	৯৮৫.৯৮
২০১১	১২৫	৮৪৫	৬.৮৪	৬১৭.৬৪	৬২৪.৪৮	২.১২	৮১৮.২১	৮২০.৩৩
২০১২	১২৫	৯০২	৯.০৭	৬২৬.৫২	৬৩৫.৫৯	২.১৪	৮২২.৬২	৮২৪.৭৬
২০১৩	১৩৪	৮৮৭	৯.০৪	৪৫০.০৭	৪৫৯.১১	১.৩৫	৯০০.১৫	৯০১.৫০
২০১৪	১৩৬	৮৯৩	৯.৮৭	৪৯২.৪৭	৫০২.৩৪	৪.২৮	১০২৮.৩৩	১০৩২.৬১

উৎস: বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০১৫

জাটকা সংরক্ষণ কর্মসূচি

ইলিশ অভয়াশ্রম সন্নিহিত ৪টি জেলার জাটকা আহরণকারী মৎস্যজীবিদের বিকল্প কর্মসংস্থান টেকসই ভিত্তিতে পরিচালনার নিমিত্তে ৫ বছর মেয়াদি জাটকা সংরক্ষণ, জেলেদের বিকল্প কর্মসংস্থান ও গবেষণা প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে। এ প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে ২০০৯ সাল হতে ২০১১ সাল পর্যন্ত প্রকল্পভূক্ত উপজেলাসমূহের জাটকা আহরণকারী অপেক্ষাকৃত দরিদ্র মৎস্যজীবিদের অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বিভিন্ন ধরনের বিকল্প কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করে প্রশিক্ষন দেয়া হয়েছে। প্রতি বছর নভেম্বর থেকে মে মাস পর্যন্ত মোট সাত মাস জাটকা রক্ষা কর্মসূচি পালন করা হয়ে থাকে। জাটকা আহরণে বিরত থাকা জেলেদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন ও বিকল্প কর্মসংস্থানের জন্য ২০১০-১১ সালে ৬,৮৬৯ টি জেলে পরিবারকে ৫.১৭ কোটি টাকা এবং ২০১১-১২ সালে ৭,৫০০ টি জেলে পরিবারকে ৫.৮৮ কোটি টাকা ব্যয়ে উপকরণ সহায়তা প্রদান এবং ৭৭৮৫ সুফলভোগীকে বিকল্প কর্মসংস্থান বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ২০১৩-১৪ অর্থবছরে ১৫ জেলার ৮১ টি উপজেলায় ২,২৪,১০২ টি জেলে পরিবারের মধ্যে ৪০ কেজি হারে ৪ মাসে মোট ৩৫.৮৬ হাজার মে.টন খাদ্যশস্য ও বিকল্প কর্মসংস্থানের জন্য ১,১৬৫ পরিবারের মধ্যে ১১৬.৬০ লক্ষ টাকা বিতরণ করা হয়েছে। ইলিশ সংরক্ষন ও অবাধ প্রজনন করার লক্ষ্যে মৎস্য অধিদপ্তরের উদ্যোগে বাংলাদেশের নৌবাহিনী,বাংলাদেশ কোষ্ট গার্ড এবং বিএফআরআই এর অংশগ্রহনে বিশেষ সমন্বিত কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়েছে।এর ফলে ২০১৩-১৪ অর্থবছরে ইলিশের উৎপাদন ৩.৮৫ মেট্রিক টন এ পৌছেছে,যা ২০০৮-০৯ অর্থবছরে ছিল ২.৯৯ লক্ষ মেট্রিকটন।

মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য রপ্তানি

বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের ক্ষেত্রে মৎস্য খাত ব্যাপক সফলতা অর্জন করেছে। বাংলাদেশ থেকে গুনগতমান সম্পন্ন হিমায়িত চিংড়ি ও মৎস্যজাত পণ্য যুক্তরাষ্ট্রও যুক্তরাজ্য,জাপান,ফ্রান্স, হংকং, সিংগাপুর,সৌদি আরব, সুদানসহ অন্যান্য উন্নত দেশে রপ্তানি হয়। ২০১৩-১৪ অর্থবছরে ০.৭৭ লক্ষ মেট্রিক টন মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য রপ্তানি করে ৪,৮৯৮.২২ কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রা অর্জিত হয়েছে। এছাড়া চলতি ২০১৪-১৫ অর্থবছরে (জানুয়ারি ২০১৫) পর্যন্ত ০.৫২ লক্ষ মেট্রিক টন মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য রপ্তানি করে ৩২০৪.২৪ কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রা অর্জিত হয়েছে। মাছের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য বিল নার্সারি কার্যক্রম গ্রহন করে মুক্ত জলাশয়ে পোনা অবমুক্তির কার্যক্রম এবং উৎপাদন থেকে ভোক্তা পর্যায়ে সকল স্তরে মৎস্যজাত পণ্যের মান নিয়ন্ত্রনের জন্য *Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP)*এবং

ট্রেসেবিলিটি (*Traceablity*) ব্যবস্থাপণা কার্যকর করার সর্বাত্মক উদ্যোগ গ্রহন করা হয়েছে। ***HACCP*** পদ্ধতি প্রবর্তনের মাধ্যমে গুনগত মানসম্পন্ন চিংড়ি রপ্তানি কার্যক্রম পরচালিত হওয়ায় এ খাতে আশাতীত সাফল্য অর্জিত হয়েছে।

প্রাণিসম্পদ

২০০৫-০৬ অর্থবছরকে ভিত্তিবছর ধরে ২০১৩-১৪ অর্থবছরের জিডিপিতে প্রাণিসম্পদ উপখাতের অবদান ছিল ১.৭৮ শতাংশ। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর সাময়িক হিসাব অনুযায়ী ২০১৩-১৪ অর্থবছরে মোট কৃষিজ জিডিপিতে প্রাণিসম্পদ উপখাতের অবদান ১৪.০৮ শতাংশ প্রাক্কলন করা হয়েছে। জিডিপিতে প্রাণিসম্পদ উপখাতের অংশ স্বল্প হলেও দৈনন্দিন খাদ্যে মানবদেহে অত্যাবশ্যকীয় প্রাণিজ আমিষের চাহিদা পূরণ,কর্মসংস্থান সৃষ্টি,চাষাবাদ,চামড়া এবং চামড়াজাত দ্রব্যাদি উৎপাদন ও রপ্তানিতে এবং বিশেষ করে খাদ্য নিরাপত্তা ক্ষেত্রে এ উপখাতের ভূমিকা অপরিসীম। গবাদি পশু ও হাঁস-মুরগির টিকা উৎপাদন ও সম্প্রসারণ, স্বল্পমূল্যে হাঁস-মুরগির বাচ্চা সরবরাহ,জাত উন্নয়নের উৎপাদিত তরল ও হিমায়িত সিমেন দ্বারা কৃত্রিম প্রজনন কার্যক্রম গ্রহন প্রভৃতি প্রাণিসম্পদ খাতের উন্নয়নের লক্ষ্যে গৃহিত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম।

২০১৪-১৫ অর্থবছরে জানুয়ারি ২০১৫ পর্যন্ত দেশে গবাদি প্রাণি ও হাঁস-মুরগির সংখ্যা দাঁড়িয়েছে প্রায় যথাক্রমে ৫ কোটি ৩৯ লক্ষ ৮৭ হাজার এবং ৩১ কোটি ৫ লক্ষ ৫২ হাজার। সারণি ৭.৮ এ দেশে প্রাণি ও পাখির পরিসংখ্যান দেয়া হল।

প্রাণি ও পাখির সংখ্যা

প্রাণি/পাখি	সংখ্যা (লক্ষ)							
	২০০৭-০৮	২০০৮-০৯	২০০৯-১০	২০১০-১১	২০১১-১২	২০১২-১৩	২০১৩-১৪	২০১৩-১৪ (জানুয়ারি ১৫)
গরু	২২৯.০	২২৯.৭৬	২৩০.৫১	২৩১.২১	২৩১.৯৫	২৩৩.৪১	২৩৪.৮৮	২৩৫.৭৪
মহিষ	১২.৬	১৩.০৪	১৩.৪৯	১৩.৯৪	১৪.৪৩	১৪.৫০	১৪.৫৭	১৪.৬১
ছাগল	২১৫.৬	২২৪.০১	২৩২.৭৫	২৪১.৪৯	২৫১.১৬	২৫২.৭৬	২৫৪.৩৯	২৫৭.৩৪
ভেড়া	২৭.৮	২৮.৭৭	২৯.৭৭	৩০.০২	৩০.৮২	৩১.৪৩	৩২.০৬	৩২.১৮
মোট গবাদি প্রাণি	৪৮৫.৫০	৪৯৫.৫৮	৫০৬.৫২	৫১৬.৬৬	৫২৮.৩৬	৫৩২.১১	৫৩৫.৯০	৫৩৯.৮৭
মুরগি	২১২৪.৭	২২১৩.৯৪	২২৮০.৩৫	২৩৪৬.৮৬	২৪২৮.৬৬	২৪৯০.০০	২৫৫৩.১১	২৫৯০.৭৯
হাঁস	৩৯৮.৪	৪১২.৩৪	৪২৬.৭৭	৪৪১.২০	৪৫৭.০০	৪৭২.৫৩	৪৮৮.৬১	৪৯৮.৩০
মোট হাঁস-মুরগি	২৫২৩.১০	২৬২৬.২৮	২৭০৭.১২	২৭৮৮.০৬	২৮৮৫.৬৬	২৯৬২.৬৪	৩০৪১.৭২	৩০৮৯.০৯

উৎস: বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০১৫

প্রাণিজ উৎস হতে দেশে উৎপাদিত খাদ্য পণ্য যেমন: দুধ,মাংস(গরু ছাগল,হাঁস-মুরগি) এবং ডিমের পরিমাণ নিয়মিতভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। ২০০৬-০৭ অর্থবছর থেকে ২০১৪-১৫ অর্থবছর(জানুয়ারি ২০১৫) পর্যন্ত প্রাণিজাত পণ্যের উৎপাদন নিম্নের সারণিতে দেখানো হলো:

দুধ, মাংস ও ডিমের উৎপাদন

দ্রব্য	একক	উৎপাদন								
		২০০৬-০৭	২০০৭-০৮	২০০৮-০৯	২০০৯-১০	২০১০-১১	২০১১-১২	২০১২-১৩	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫
দুধ	লক্ষ টন	২২.৮	২৬.৫০	২২.৮৬	২৩.৬৫	২৯.৪৭	৩৪.৬৩	৫০.৬৭	৬০.৯০	৪৫.৪১
মাংস	লক্ষ টন	১০.৪	১০.৪০	১০.৮৪	১২.৬৪	১২.৮৬	২৩.৩২	৩৬.২০	২৩.৩২৪৫.২০	৩৯.৮৬
ডিম	লক্ষ টি	৫৩৬৯০	৫৬৫৩২	৪৬৯২০	৫৭৪২৪	৬০৭৮৫	৭৩০৩৮	৭৬১৭৩.৮০	১০১৩৮০	৫৭৫৮০.৭২

উৎস: বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০১৫

গবাদি প্রাণির কৃত্রিম প্রজনন

কৃত্রিম প্রজনন একটি গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম। বর্তমানে সভারস্থ কেন্দ্রীয় কৃত্রিম প্রজনন গবেষণাগার ও জেলা কেন্দ্রে রক্ষিত উন্নত জাতের ষাঁড়ের সিমেন সংগ্রহ করে তরল ও হিমায়িত উপায়ে সমগ্র দেশব্যাপী কৃত্রিম প্রজনন সম্প্রসারণ কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। দেশের ৩,৭৫২ টি কৃত্রিম প্রজনন উপ-কেন্দ্র ও পয়েন্টের মাধ্যমে হিমায়িত ও তরল সিমেন ব্যবহার করে কৃত্রিম প্রজনন সম্প্রসারণ কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। চলতি ২০১৪-১৫ অর্থবছরে জানুয়ারি,২০১৫ পর্যন্ত কৃত্রিম প্রজনন কৃত গাভীর সংখ্যা দাড়িয়েছে ১৭.৭৮ লক্ষ।

প্রাণি সম্পদ আইন প্রণয়ন ও প্রাণি সম্পদ অবকাঠামো উন্নয়ন

গবাদিপশু-পাখির মানসম্মত খাদ্য সরবরাহ এবং নির্বিচারে গবাদিপশু জবাই রোধসহ মানুষের জন্য মানসম্মত মাংস সরবরাহের বিষয়াদি বিবেচনা করে যথাক্রমে মৎস্য ও পশু খাদ্য আইন ২০১০ এবং পশু জবাই ও মাংসের মাননিয়ন্ত্রন আইন ২০১১ জাতীয় সংসদ কর্তৃক পাশ হয়েছে। বর্তমানে এ আইন দুটির বিধিমালা প্রণয়নের কাজ চলছে। পশু খাদ্য বিধিমালা ২০১৩ কার্যকর হয়েছে। এ ছাড়া বাংলাদেশে চিড়িয়াখানা আইন ২০১০ প্রণয়নের কাজও চলমান রয়েছে।

দেশে প্রাণি চিকিৎসার আধুনিক সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে ৬৪ টি জেলা সদরে প্রতিষ্ঠিত জেলা প্রাণি হাসপাতালগুলোতে চিকিৎসা সেবার পাশাপাশি পোল্ট্রি ও গবাদি প্রাণির রোগ নির্ণয় এবং কেন্দ্রীয় প্রাণিপুষ্টি গবেষণাগার ও নির্বাচিত জেলাগুলোতে প্রাণি পুষ্টি গবেষণাগার হতে পোল্ট্রি ও গবাদি প্রাণির খাদ্য বিশ্লেষণের মাধ্যমে সুষম খাদ্য নিশ্চিত করতে প্রয়োজনীয় সহায়তা দেওয়া হচ্ছে। উপজেলা ভেটেরিনারি ডিসপেনসারি কেন্দ্র হতেও রোগ নির্ণয় ও চিকিৎসা সুবিধার পাশাপাশি ক্ষুদ্রখামারি ও কৃষকগনকে গবাদি প্রাণি, হাঁস-মুরগি লালন পালনের উপর প্রশিক্ষণ ও পরামর্শ সেবা প্রদান করা হচ্ছে। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত অনেকেই আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য খামার স্থাপন করেছেন। উপজেলা প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্র (*ULDC*) প্রকল্প (৩য় পর্যায়) এর মাধ্যমে বিভিন্ন উপজেলায় পুরাতন ইউএলডিসি মেরামত ও নতুন ইউএলডিসি নির্মান এবং হ্যাচারিসহ আঞ্চলিক হাঁস প্রজনন খামার স্থাপন প্রকল্প (৩য় পর্যায়ে) কর্তৃক বিভিন্ন সরকারি খামারে হ্যাচারি স্থাপন এবং অন্যান্য প্রকল্পের মাধ্যমে বিভিন্ন অবকাঠামো নির্মাণ কাজ চলছে।

প্রতিরোধক টিকা ও চিকিৎসা প্রদান

প্রাণি অধিদপ্তর গবাদিপ্রাণি ও হাঁস-মুরগির বিভিন্ন রোগ প্রতিরোধ করার জন্য বর্তমানে ১০ প্রকারের টিকা উৎপাদন, বিতরণ ও প্রয়োগ করে আসছে। ২০১৪-১৫ অর্থবছরের জানুয়ারি পর্যন্ত মোট ৭ কোটি ৯৭ লক্ষ ৪১ হাজার ৬৭২ ডোজ টিকা বীজ উৎপাদিত হয়েছে। একই অর্থবছরে উল্লিখিত সময়ে মোট ৩৩.৫৯ লক্ষ গবাদিপ্রাণি ও ৩৪০.৬৮ লক্ষ হাঁস-মুরগির চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হয়েছে।

এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা/বার্ড ফ্লু

২০০৭ সালের ২২ মার্চ সাভারস্থ বিমান পোল্ট্রি কমপ্লেক্স এ প্রথম এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা/বার্ড ফ্লু সনাক্ত করা হয়। রোগটির বিস্তার রোধ ও এর কারণে জনস্বাস্থ্যের ক্ষতি প্রতিরোধকল্পে ২০১৪-১৫ অর্থ বছরে এ পর্যন্ত ৮১৭ টি আক্রান্ত খামারের ২৭,২২,৯৭০ টি মুরগি এবং ৩৬,০০,৬৩২টি ডিম ধ্বংস করা হয়েছে। এছাড়া Avian Influenza Preparedness and Response Project এবং Strengthening of Support Services for Combating Avian Influenza in Bangladesh শীর্ষক দুটি প্রকল্প বর্তমানে বাস্তবায়নাধীন আছে। এভিয়েশন ইনফ্লুয়েঞ্জারোগ সনাক্তকরণ ও ত্বরিৎ ব্যবস্থা গ্রহন নিশ্চিত করণের লক্ষ্যে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরে স্থাপিত হয়েছে ওয়েবভিত্তিক এস,এম,এস গেইটওয়ে সিস্টেম যার মাধ্যমে সংক্ষিপ্ত বার্তা প্রেরণ ও গ্রহন করে তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে,যা রোগটি নিয়ন্ত্রণে সহায়ক ভূমিকা রাখছে।

কৃষি খাতের বাজেট

দেশের কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি, দারিদ্র্য নিরসন ও জনগণের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে সার্বিক কৃষি খাতে ২০১৪-১৫ অর্থবছরে কৃষি,খাদ্য এবং মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের অনুকুলে মোট ১৫,৪১৯ কোটি টাকা (অনুন্নয়ন খাতে ১২,৬০৯ কোটি টাকা এবং উন্নয়ন খাতে ২,৮১০ কোটি টাকা) বরাদ্দ রয়েছে, যা মোট বাজেটের ৬.১৫ শতাংশ। দেশজ কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে কৃষকদের সহায়তা প্রদানের জন্য সার ও অন্যান্য কৃষি কার্যক্রমের ভর্তুকি

বাবদ ২০১৪-১৫ অর্থবছরের বাজেটের ৯,০০০.০০ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে। কৃষি ভর্তূকি বাবদ বরাদ্দকৃত অর্থ হতে ফেব্রুয়ারি,২০১৫ পর্যন্ত মোট ৩,০৬১.৬৬ কোটি টাকা ছাড় করা হয়েছে। তাছাড়া,কৃষি পুনর্বাসন সহায়তা বাবদ বরাদ্দ রাখা হয়েছে ৬৭.১৫ কোটি টাকা,এর মধ্যে ছাড় করা হয়েছে ২৩.৯৮ কোটি টাকা।

মাছ ও চিংড়ি চাষে পরিবর্তনের ধারা

মাছ ও চিংড়ি চাষ বাংলাদেশে নতুন নয়; তবে ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে ব্যপকভাবে এসবের চাষ অবশ্যই নতুন। আবহমান কাল থেকে বাংলাদেশের মানুষের প্রধান খাদ্য হল ভাত ও মাছ। এদেশে পুকুর, খাল-বিল, ডোবা হাওর ইত্যাদিতে চিরায়ত প্রথায় মিঠা পানির বিভিন্ন প্রজাতির মাছ চাষ হয়ে আসছে। আগে পারিবারিক প্রয়োজন মেটানো এবং কিছু উদ্বৃত্ত সৃষ্টির উদ্দেশ্যে মূলত জেলে সম্প্রদায় এ কাজে নিয়োজিত থাকতো। কিন্তু বিগত কয়েক বছরে মানুষের চাহিদা বৃদ্ধি, মাছের উচ্চ দাম, মাছ চাষের কৌশলে পরিবর্তনের ক্ষেত্রে সরকারের সক্রিয় সহযোগিতা, আত্মকর্মসংস্থানের ব্যবস্থা ইত্যাদির প্রেক্ষিতে মাছ চাষের ক্ষেত্রে অনেক পরিবর্তন ঘটেছে। সাম্প্রতিককালে মাছের উৎপাদনবৃদ্ধির লক্ষ্যে সরকার বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহন করেছে। এগুলো হলঃ সমাজভিত্তিক মৎস্য চাষ কার্যক্রম সম্প্রসারণ ও জোরদারকরণ, বিল নার্সারি কার্যক্রমন গ্রহন, মুক্ত জলাশয়ে মাছের পোনা অবমুক্তকরণ, মৎস্য অভয়াশ্রম সৃষ্টি, ভরাট হয়ে যাওয়া নদী পুনঃখনন করে মাছের আবাসস্থল পুনরুদ্ধার ইত্যাদি। এসব কার্যক্রমের ফলে গত কয়েক বছরে মাছের উৎপাদন লক্ষ্যনীয়ভাবে বেড়েছে।

মাছের উৎপাদন (অভ্যন্তরীণ) লক্ষ মে. টন

অর্থবছর	২০০৭-০৮	২০১০-১১	২০১৩-১৪
উৎপাদন	২০.৬৬	২৫.১৫	২৯.৫১

বর্তমান সময়ে অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক বাজারে চিংড়ির চাহিদা বিপুলভাবে বেড়ে যাওয়ায় এবং চিংড়ি চাষ স্বকর্মসংস্থানের একটি উত্তম উপায় হিসেবে পরিগণিত হওয়ায় দেশে চিংড়ি চাষের যথেষ্ঠ প্রসার ঘটেছে। প্রধানত সমুদ্রপোকূলবর্তী জেলাগুলোর নিম্নভূমিতে পরিকল্পিতভাবে চিংড়ি চাষ হচ্ছে। সাধারণত ধান চাষের উপযোগী নয় এমন জমিতে চিংড়ি চাষ করা হচ্ছে।

পূর্বে দেশের খাল-বিল ও পুকুর অন্যান্য মাছের সাথে চিংড়িও চাষ করা হতো। কিন্তু এখন এর চাষের জন্য নির্মিত ঘের গুলোতে সর্বাধুনিক উপায়ে কেবল চিংড়ি চাষ করা হচ্ছে। এসব ঘেরে বাগদা গলদা, বন্না, ছটা নামের চিংড়ি চাষ করা হয়। তবে এসবের মধ্যে গলদা ও বাগদা চিংড়ির চাষই প্রধান। আগে কেবল প্রাকৃতিক উৎস থেকে চিংড়ি পোনা সংগ্রহ করা হতো; কিন্তু বর্তমানে সমুদ্র থেকে চিংড়ি পোনা আহরণের পাশাপাশি বেসরকারি খাতে হ্যাচারির মাধ্যমে চিংড়ি পোনা উৎপাদিত হচ্ছে। দেশে বর্তমানে ৭ হাজারেরও অধিক খামারে বাগদা এবং ১ লক্ষেরও অধিক খামারে গলদা চিংড়ি চাষ করা হয়। আশির দশকে প্রায় ৫০ হাজার হেক্টর জমিতে চিংড়ি চাষ করা হতো; বর্তমানে তা বৃদ্ধি পেয়ে প্রায় ১ লক্ষ ৪০ হাজার হেক্টর হয়েছে। চিংড়ি রপ্তানিকে কেন্দ্র করে দেশে অনেক চিংড়ি প্রক্রিয়াকরণ কারখানা গড়ে উঠছে; বর্তমানে এ কারখানার সংখ্যা ১২৯ টি। পূর্বে চিংড়ি চাষ কেবল জেলেদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল কিন্তু এখন তা অনেকের কাছেই আত্মকর্মসংস্থান, অর্থোপার্জন ও বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের একটি সুন্দর উপায় হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে।

মাশরূম চাষে পরিবর্তনের ধারা

মাশরূম একটি প্রোটিন বা আমিষ সমৃদ্ধ সবজি; একে অনেকে আবার সবজি মাংস বলেও অভিহিত করেন। এতে ক্যালরি ও চর্বি খুব কম থাকলেও ভিটামিন ও খনিজ পদার্থ পর্যাপ্ত পরিমাণে থাকে। খাদ্য বিশেষজ্ঞদের মতে সবচেয়ে নির্দোষ ও মুখরোচক উপায়ে সর্বোচ্চ পুষ্টি একমাত্র মাশরূম থেকে পাওয়া যায়। এর উৎপাদনে সার বা কীটনাশক এর ব্যবহার করা হয় না বলে এটি পরিবেশ ও শরীর বান্ধবও বটে।

ছায়াযুক্ত কুঁড়েঘরে, গোলপাতা ঘর, বা বাঁশের চালা ঘরে মাশরূম করা হয়। সেখানে বাঁশ বা কাঠের তৈরি তাকের উপর রক্ষিত বিভিন্ন আধারে অত্যন্ত নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে এর চাষ করা হয়। বাংলাদেশে পূর্বে খাবার অনুপযোগী মাশরুম

যত্রতত্র আপনা-আপনি গজালেও বর্তমানে নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে খাবার উপযোগী বিভিন্ন ধরনের মাশরুম বাণিজ্যিক ভিত্তিতে চাষাবাদ করা হচ্ছে । বর্তমানে এ দেশে যেসব মাশরুম চাষ করা হচ্ছে তার মধ্যে ওয়েস্টার, মিল্ক, স্ট্র, শিতা, ঋষি বাটন, প্রভৃতি প্রধান।

সম্প্রতি বাংলাদেশে মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্তের লোকদের খাদ্য তালিকায় মাশরুম একটি পুষ্টিকর, সুস্বাদু ও স্বাস্থ্যসম্মত খাদ্য হিসেবে ধীরে ধীরে নিজের স্থান করে নিচ্ছে। এখন অনেকেই সবজি আর মাংসের সাথে মাশরুম ব্যবহার করছেন। তাছাড়া এর দ্বারা স্যুপ, অমলেট, পাকোড়া,ঘুঘনি, ফ্রাই ইত্যাদিও তৈরি করা হয়। বর্তমানে বাংলাদেশে প্রায় সর্বত্রই এটি বানিজ্যিক ভিত্তিতে চাষাবাদের চেষ্টা চলছে এবং অনেকেই এর চাষকে আত্মকর্মসংস্থানের উপায় হিসেবে বেছে নিচ্ছে। স্বল্প পরিসরে, সামান্য পুজিতে ও অতি অল্পসময়ে এটি উৎপাদন করা যায়। বর্তমানে এর বাজার মূল্য অধিক হওয়ায় অল্প ব্যায়ে এ চাষ থেকে প্রচুর মুনাফা অর্জন করা যায়।

মাশরুমের উপকারিতা অনেক। এতে শর্করা, খাদ্যোপযোগী আঁশ, চর্বি,আমিষ, বিভিন্ন খাদ্যপ্রাণ,খনিজ পদার্থ,স্টেরল ইত্যাদি পুষ্টিউপাদান যথেষ্ট মাত্রায় উপস্থিতথাকে। এসব পুষ্টি উপাদান নানা ভাবে মানুষের দেহের জন্য উপযোগী। হাড় ও দাঁত মজবুত করা, শরীর প্রাণবন্ত রাখা, শরীরের ওজন কমানো, ডায়াবেটিস রোগীদের আদর্শ খাবার ইত্যাদি ক্ষেত্রে মাশরুম অতুলনীয়। মাশরুমের ঔষধী গুনও রয়েছে।

বন ও নার্সারি স্থাপনের পরিবর্তনের ধারা

সাধারণভাবে বিস্তৃত এলাকাজুড়ে বৃহদাকার গাছপালা, ঝোপ-ঝাড়, গুল্মলতা ইত্যাদি দ্বারা আচ্ছাদিত স্থানে যেখানে প্রাকৃতিক ভাবে বন্য পশু-পাখি, কীট-পতঙ্গ ও অন্যান্য জীবজন্তু বসবাস করে তাকেই বন বলা হয়। বাংলাদেশের বন তার প্রাকৃতিক সম্পদের অন্তর্গত। এখানকার বনভূমি থেকে বাঁশ, কাঠ, মধু ইত্যাদি বনজ সম্পদ আহরিত হয়; এটি বিভিন্ন প্রজাতির জীব-জন্তুর আবাসস্থলও বটে। এ দেশের প্রাকৃতিক পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় বন গুরুত্বপূর্ণ। প্রাকৃতিক ও মনুষ্যসৃষ্ট কারণে এখানে এক সময় কিছু বনভূমির বিনাশ ঘটলেও পরবর্তিতে তা বিভিন্ন কার্যক্রমের মাধ্যমে পুষিয়ে নেয়া হচ্ছে। এ প্রক্রিয়ায় বনায়নের ক্ষেত্রে কিছু পরিবর্তন দেখা যায়।

বাংলাদেশ সরকারের বন অধিদপ্তর ইতোমধ্যে দেশে বনায়ন কার্যক্রম জোরদার করার জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহন করেছে। এর মধ্যে দীর্ঘ ও স্বল্প মেয়াদি বাগান সৃজন, বরেন্দ্র গালি বনায়ন, প্রতিষ্ঠান বনায়ন,বিক্রি ও বিতরণের জন্য চারা উত্তোলন,ম্যানগ্রোভ বানায়ন প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। বনের জীব বৈচিত্র্য ও প্রাকৃতিক পরিবেশ সংরক্ষণের অংশ হিসেবে সোনাচর, চাদপাই, দুদমুখী, বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য ইত্যাদি রক্ষিত এলাকা হিসেবে ঘোষিত হয়েছে।

ফিল্ড সার্ভের মাধ্যমে কৃষিজ,বনজ,ভেষজ,ক্ষয়িষ্ণু ও বিলুপ্তপ্রায় উদ্ভিদসহ সকল প্রকার বৃক্ষলতা প্রজাতির নমুনা সংগ্রহ,সনাক্তকরণ ও সংরক্ষণের জন্য বাংলাদেশ ন্যাশনাল হারবেরিয়াম প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এছাড়া দেশের বনজ সম্পদ যথাযথভাবে কাজে লাগানোর জন্য বাংলাদেশ বনশিল্প উন্নয়ন করপোরেশন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বন উন্নয়ন ও বনজ সম্পদ বিষয়ক গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউট হচ্ছে।

নার্সারি স্থাপন দেশে বনায়ন কার্যক্রমেরই অংশ। এর মাধ্যমে একদিকে যেমন বনায়নের জন্য মূল্যবান চারা উৎপাদন ও বিতরণ করা যায়, তেমনি অন্যদিকে স্বকর্মসংস্থানেরও ব্যবস্থা হয়। যে জায়গায় চারা উৎপাদন করে অন্য কোথাও রোপনের পূর্ব পর্যন্ত তা পরিচর্যা ও রক্ষণাবেক্ষণ করা হয় তাকে নার্সারি বলে।পূর্বে কেবল আম, জাম, কাঠাল, কুল, পেপে, ইত্যাদি ফলের চারা উৎপাদন করে বিক্রয় করা হতো। বর্তমানে বনায়ণ প্রক্রিয়া জোরদার করার জন্য এখানে মেহগনি, সেগুন, কড়াই, শাল, গর্জন, চাপালিশ ইত্যাদি চারাও উৎপাদন করা হচ্ছে। এছাড়া বি.এ.ডি.সি ৯টি উদ্যান উন্নয়ন কেন্দ্র ও ১২টি এগ্রো সার্ভিস সেন্টারে উৎপাদিত বিভিন্ন ফসলের চারা, কলম, গুটি ইত্যাদি উৎপাদন ও চাষী পর্যায়ে বিতরণ কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়েছে।

শিক্ষার্থীর কাজ	
বাংলাদেশে কৃষি খাতে শস্য উৎপাদন,মৎস্য চাষ, গবাদিপশু ও হাঁসমুরগি প্রতিপালন, চিংড়ি ও মাশরুম চাষ, বন ও নার্সারি স্থাপনে পরিবর্তনের গতিধারা বিশ্লেষণ করুন।	

সারসংক্ষেপ

- স্বাধীনতার পর কৃষি উৎপাদনযোগ্য ভূমির পরিমান তেমন বৃদ্ধি পায় নি অথচ প্রতিদিন বৃদ্ধি পেয়েছে খাদ্যগ্রহণ কারীর সংখ্যা। বিদ্যমান কৃষি ভূমিতে বসতবাড়ি নির্মাণ ও নগরায়নের ফলে কৃষি উৎপাদনযোগ্য ভূমির পরিমান ব্যাপক ভাবে হ্রাস পাওয়া স্বত্বেও কৃষি উৎপাদনে বাংলাদেশের সফলতা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এ পরিবর্তন উৎপাদন কলাকৌশল, উপকরণসমূহের প্রয়োগ, শস্য-উদ্ভিদ ও প্রাণিজ সম্পদ পরিচর্যা, উৎপাদনের পরিমান ইত্যাদি ক্ষেত্রে বেশি লক্ষণীয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ২.৪

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। বর্তমানে বাংলাদেশে কতটি উচ্চ ফলনশীল ধানের চাষ হচ্ছে?

ক) প্রায় ৩৫টি খ) প্রায় ৩৬টি গ) প্রায় ৩৭টি ঘ) প্রায় ৩৮টি

২। দেশের মোট কৃষিজ আয়ের কত শতাংশ মৎস্য খাত থেকে আসে?

ক) ২১.৬০ খ) ২২.৬০ গ) ২৩.৬০ ঘ) ২৪.৭০

৩। আমাদের দৈনন্দিন খাদ্যে প্রাণিজ আমিষের কত শতাংশ যোগান দেয় মাছ?

ক) ৪০ খ) ৫০ গ) ৬০ ঘ) ৭০

পাঠ ২.৫ কৃষি ঋণ ও কৃষি উপকরণ বিতরণ
Agricultural Debt and Distribution of Agricultural Inputs

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা-

- বাংলাদেশে কৃষি ঋণের প্রয়োজনীয়তা এবং কৃষি ঋণ বিতরনের উপযোগীতা বিশ্লেষণ করতে পারবেন;
- বাংলাদেশে কৃষি ঋণের উৎস এবং কৃষি ঋণ সমস্যার সমাধান বর্ণনা করতে পারবেন;
- বাংলাদেশের কৃষি উপকরণ বিতরনের বিভিন্ন কর্মসূচী বর্ণনা করতে পারবেন।

মূলপাঠ

বাংলাদেশে কৃষি ঋণের প্রয়োজনীয়তা

কৃষি উৎপাদন বাড়ানোর জন্য বিভিন্ন উপকরণ ক্রয়, পানি সেচের ব্যবস্থা করা, গুদামঘর নির্মান, উৎপাদিত পণ্য বাজারজাত করন ইত্যাদি কাজের জন্য কৃষকদের যে ঋনের প্রয়োজন হয় তাই হলো কৃষি ঋণ। কৃষি কর্মকান্ড ছাড়া অন্যান্য কারনে কৃষক যে ঋণ গ্রহন করে তাকে কৃষি ঋণ হিসেবে গন্য করা যায় না। উৎপাদনের অন্যান্য খাতের মতো কৃষিতে মূলধনের গুরুত্ব অপরিসীম। সুষ্ঠুভাবে কৃষিকাজ পরিচালনা করতে হলে উন্নত ধরনের কৃষি যন্ত্রপাতি, ভাল বীজ, সার প্রভৃতি একান্ত প্রয়োজন, কিন্তু সর্বনাশা দারিদ্র্যের কারণে বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশের কৃষক কৃষির উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় মূলধন সংগ্রহ করতে পারে না। ফলে তাকে ঋণের উপর নির্ভর করতে হয়। কিন্তু কৃষি ঋণের প্রকৃতি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে গ্রাম্য মহাজনেরা কৃষকদের চিরস্থায়ী দারিদ্র্যকে ঋণী করে যুগ যুগ ধরে তাদেরকে শোষন করেছে।

বাংলাদেশে কৃষি উন্নয়নে কৃষি ঋণের প্রয়োজনীয়তা নিচে উল্লেখ করা হল:

১. **স্বল্প আয়:** জমির উৎপাদিকা শক্তি কম বলে আমাদের দেশের কৃষকদের আয় অত্যন্ত কম। ফলে পরিবারের ভরণ পোষণ ও জমি চাষের খরচ চালাতে গিয়ে তারা ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়ে।

২. **উৎপাদন ব্যয় নির্বাহ:** দরিদ্র্য কৃষক উৎপাদন ব্যায় নির্বাহের জন্য প্রয়োজনীয় মূলধন নির্বাহ করতে পারে না। ফলে কৃষি যন্ত্রপাতি,বীজ-সার ইত্যাদি ক্রয়; গরু-ছাগল, হাঁস-মুরগির খামার স্থাপন ইত্যাদি কৃষি উৎপাদন ব্যয় নির্বাহের জন্য কৃষককে ঋণ গ্রহন করতে হয়।

৩. **জমির স্থায়ী উন্নতি সাধন:** নিত্য প্রয়োজনীয় ব্যায় নির্বাহের পর অনেক সময় দরিদ্র কৃষকের পক্ষে নিজস্ব ব্যয়ে জমির উন্নতি সাধন করা সম্ভবপর হয় না। ফলে জমির স্থায়ী উন্নতি সাধনের জন্য কৃষক ঋণ গ্রহন করে।

৪. **পুরনো পদ্ধতিতে চাষাবাদ:** বাংলাদেশের মত দরিদ্র দেশগুলোতে এখনো সনাতন পদ্ধতিতে চাষাবাদ করা হয়। এতে ফসল কম হয়। ফলে কৃষকের আয়ও কম হয়। এ কারনে অনেক কৃষককে ঋণ গ্রহন করতে হয়।

৫. **প্রাকৃতিক দূর্যোগ:** বাংলাদেশের বন্যা, ঘূর্ণিঝড় প্রভৃতি দুর্যোগ প্রায় নিয়মিত ব্যাপার। এতে দেশে ফসলহানি,দুর্ভিক্ষ ইত্যাদি দেখা দেয় এবং কৃষক ঋণ গ্রহন করতে বাধ্য হয়।

৬. **গবাদি পশুর অভাব:** আমাদের দেশে গাবদিপশুর একান্ত অভাব রয়েছে। অনেক সময় হালের জন্য বলদ ক্রয়করার জন্য কৃষক ঋণ গ্রহন করে। কোন রকমের রোগের ফলে হালের বলদের মৃত্যু হলে কৃষকের আর কোনো উপায় থাকে না।

৭. **বাজার ব্যবস্থার ত্রুটি:** বাজার ব্যবস্থার ত্রুটির জন্য উন্নয়নশীল দেশের কৃষকরা তার পণ্যের ন্যায্য মূল্য পান না। দালাল মাহাজন ও অন্যান্য ব্যবসায়ীরা আমাদের কৃষকদেরকে প্রতারিত করে। সুষ্ঠু যাতায়াত ব্যবস্থার অভাবে কৃষক তার পণ্য দূরবর্তি বাজারে নিয়ে যেতে পারে না। ফলে অনেক সময় সে তার ফসলের অর্ধেক মূল্যও পায় না।

৮. **ত্রুটিপূর্ণ ঋণ ব্যবস্থা:** বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশসমূহের ঋণদান ব্যবস্থা খুবই ত্রুটি পূর্ণ। বেসরকরি ঋণদাতারা কৃষকদের কাছ থেকে অত্যন্ত চড়া সুদ আদায় করে। অনেক ক্ষেত্রে সুদের হার ৬০% ও দেখা গেছে।

৯. **পরিপূরক আয়ের অভাব:** আমাদের কৃষক শুধু কৃষির উপর নির্ভর করে। অবসর সময়ে অন্য কাজ করার সুবিধা তাদের নেই। দেশে কুটির শিল্পের প্রসার ঘটলে কৃষক অবসর সময়ে আয় করে তাদের আর্থিক অবস্থার উন্নতি করতে পারত।

১০. **কৃষকের অদুরদর্শিতা:** শিক্ষার অভাবে সাধারণত কৃষকসমাজ অদুরদর্শি। যে বছর ফসল ভাল হয় সে বছর সঞ্চয় না করে অযথা টাকা পয়সা নষ্ট করে। ফলে ফসল খারাপ হলে ঋণ করা ছাড়া আর কোন উপায় থাকে না।

১১. **জনসংখ্যার চাপ:** শিল্পে অনুন্নত দেশসমূহের কৃষির উপর জনসংখ্যার চাপ খুব বেশি। বর্ধিত পরিবার পরিজনের ভরন পোষণ করতে গিয়ে অনেক সময় কৃষক সম্প্রদায় ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়ে।

১২. **শিল্পোন্নয়নের অভাব:** উন্নয়নশীল দেশসমূহে শিল্পোন্নয়নের গতি অত্যন্ত মন্থর। শিল্পোন্নয়নের গতি দ্রুত হলে কৃষির উপর জনসংখ্যার চাপ হ্রাস পেত। উদ্বৃত্ত লোক কল-কারখানায় কাজ করার সুযোগ পেত।

১৩. **দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি:** বাংলাদেশে অকৃষি জিনিসপত্রের দাম অস্বাভাবিক গতিতে বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে। ফলে কৃষক তার সীমিত আয়ের সাহায্যে সংসার চালাতে না পেরে ঋণগ্রস্থ হয়ে পড়ে।

বাংলাদেশে কৃষি ঋণের উৎস ও তার সমস্যার সমাধান।

বাংলাদেশের কৃষি ঋণের উৎসমূহকে প্রধাণত দু শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। যথা:

(ক) অপ্রাতিষ্ঠানিক উৎস ও

(খ) প্রাতিষ্ঠানিক উৎস

যে সকল উৎসের উপর সরকার বা বাংলাদেশ ব্যাংকের কোন নিয়ন্ত্রণ নেই সে সকল উৎসকে অপ্রাতিষ্ঠানিক উৎস বলে। আত্মীয়-স্বজন,বন্ধু-বান্ধব,গ্রাম্য মহাজন,গ্রাম্য ব্যবসায়ী,বেনিয়া ও ধনী ব্যক্তি ইত্যাদি অপ্রাতিষ্ঠানিক উৎসের অন্তর্ভূক্ত। পক্ষান্তরে যে সকল উৎসের উপর সরকার ও বাংলাদেশ ব্যাংকের শর্তাবলি আরোপিত ও নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত সে সকল উৎসকে প্রাতিষ্ঠানিক উৎস বলে। বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক, সমবায় ঋনদান সমিতি, ভূমি বন্ধকি ব্যাংক, বানিজ্যিক ব্যাংক,বাংলাদেশ ব্যাংক ও সরকার প্রভৃতি প্রাতিষ্ঠানিক উৎসের অন্তর্ভূক্ত। কৃষি ঋণের উৎসসমূহ একটি তালিকার মাধ্যমে প্রকাশ করা যেতে পারে।

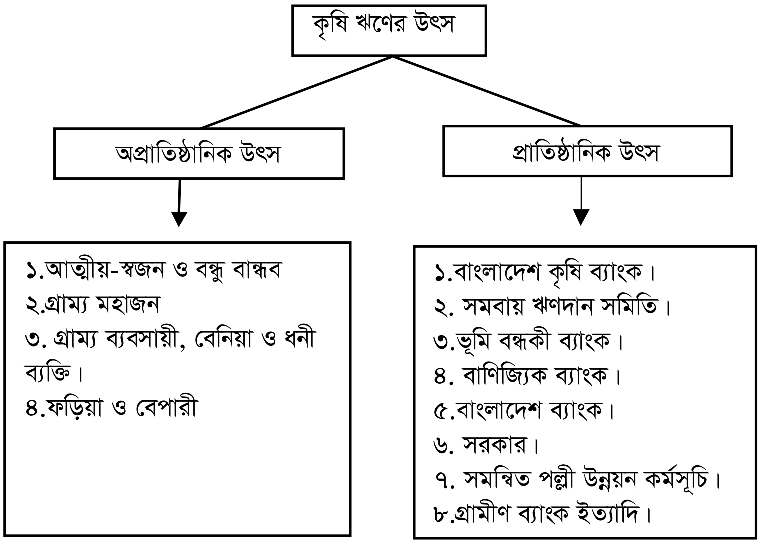

(ক) অপ্রাতিষ্ঠানিক উৎস

১। আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধব: কৃষকেরা অনেক সময় আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবের নিকট হতে ঋণ গ্রহন করে। এ উৎস হতে গৃহীত ঋণের জন্য বেশির ভাগ ক্ষেত্রে সাধারণত সুদ দিতে হয় না। সুদ দিতে হলেও সুদের হার কম। ঋণ পরিশোধের ক্ষেত্রে কোন বাধাঁধরা নিয়ম থাকে না এবং সাধারণত অতি অল্প সময়ের জন্য এ উৎস থেকে ঋণ গ্রহন করা হয়।

২। গ্রাম্য মহাজন: গ্রাম্য মহাজনেরা সোনা রূপা অন্যান্য দামী দ্রব্য ও জমি বন্ধক রেখে অত্যন্ত উচ্চহার সুদে কৃষকদের ঋণ প্রদান করে। অবিভক্ত ভারতে গ্রাম্য মহাজনই ছিল কৃষি ঋণ সরবরাহের প্রধান উৎস। কৃষি ঋণের শতকরা ৭০ ভাগই সরবরাহ করা হত গ্রামের মহাজন কর্তৃক। ভারত বিভক্তির পর অধিকাংশ হিন্দু মহাজন ভারতে চলে যায়। ফলে আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধব প্রধান স্থান অধিকার করে।

৩. গ্রাম্য ব্যবসায়ী, বেনিয়া ও ধনী ব্যক্তি: কৃষকেরা অনেক সময় গ্রামের ছোট ছোট ব্যবসায়ী,বেনিয়া ও ধনী ব্যক্তিদের নিকট হতে ঋণ গ্রহন করেন। এ ক্ষেত্রে কৃষকেরা ঋণদাতার নিকট ন্যায্য দাম অপেক্ষা কম দামে শস্য বিক্রয় করতে আঙ্গীকারাবদ্ধ হয়ে ঋণ গ্রহন করে। আবার কোন সময় ঋণ দাতাদের নিকট তাদের জমি বন্ধক রেখে ঋণ গ্রহন করে। এ ক্ষেত্রে সময় মত ঋণ পরিশোধ করতে ব্যার্থ হলে ঋণদাতা জমির মালিকে পরিণত হয়। বর্তমানে গ্রামবাংলায় এ ধরনের ঋণ যথেষ্ট প্রাধান্য বিস্তার করেছে।

৪। ফরিয়া ও বেপারী: গ্রাম্য ফরিয়া ও ব্যাপারীগণও অনেক সময় কৃষকদেরকে ঋণ দিয়ে থাকে। প্রয়োজনে কৃষকগণ তাদের নিকট হতে ঋণ সংগ্রহ করে বিশেষ ভাবে উপকৃত হয়।

(খ) প্রাতিষ্ঠানিক উৎস

১। বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক ও রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক: কৃষকদের ঋণ প্রদানের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক ও রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক স্থাপিত হয়েছে। কৃষি ও কৃষি ভিত্তিক শিল্প প্রতিষ্ঠানে এই দুটি প্রতিষ্ঠান ঋণ প্রদান করে। এ দুটি ব্যাংক জমি বন্ধক রেখে স্বল্প,মধ্যম ও দীর্ঘমেয়াদী ঋণ প্রদান করে থাকে। বর্তমানে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে এ দুটি ব্যাংকের শাখা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সার,বীজ ও কীটনাশক ঔষধপত্র ক্রয়ের জন্য স্বল্প মেয়াদি যন্ত্রপাতি, গো-মহিষ ক্রয় ও পশুপালনের জন্য মধ্যমমেয়াদী এবং ভূমি উন্নয়ন, গুদামঘর নির্মাণ ও ভারি যন্ত্রপাতি ক্রয়ের জন্য দীর্ঘমেয়াদী ঋণ প্রদান করে।

২। সমবায় ঋণ দান সমিতি: সমবায় ঋণ দান সমিতিগুলো পল্লী গ্রামে অবস্থিত এবং কৃষকদের দ্বারা সংগঠিত। এ সব ঋণদান সমিতির শির্ষে আছে জাতীয় সমবায় ব্যাংক। বাংলাদেশ ব্যাংক ও কৃষি ব্যাংক সাধারণত জাতীয় সমবায় ব্যাংকের মাধ্যমে এ সব সমিতিকে প্রয়োজনীয় তহবিল প্রদান করে।

৩। ভূমি বন্ধকী ব্যাংক: ভূমি বা জমি বন্ধকি ব্যাংক কৃষকদের জমি বন্ধক রেখে সাধারণত দীর্ঘমেয়াদি ঋণ প্রদান করে। সাধারণত ২০ বছরের মধ্যে এ ব্যাংক হতে গৃহিত ঋণ পরিশোধ করতে হয়। জমি বন্ধকী ব্যাংকের সুদের হার তুলনামূলক ভাবে কম।

৪। বাণিজ্যিক ব্যাংক: বর্তমানে বানিজ্যিক ব্যাংকসমূহ প্রত্যক্ষভাবে কৃষকদেরকে ঋণ প্রদান করে থাকে। পূর্বে পাট বাজারজাতকরনের জন্য কৃষিক্ষেত্রে বাণিজ্যিক ব্যাংকের ঋন প্রদান সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু ১৯৭৭ সাল হতে বাংলাদেশ ব্যাংক এর নির্দেশ ও সহযোগিতায় দেশের রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো কৃষি ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে সক্রিয় ভূমিকা পালন করছে।

৫। বাংলাদেশ ব্যাংক: বাংলাদেশ ব্যাংক কৃষকদের ঋণপ্রদান না করলেও এ ব্যাংক কৃষি ঋণদান কারী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানকে ঋণ প্রদান করে থাকে। বাংলাদেশ ব্যাংক কৃষি বিভাগ নামে একটি বিভাগের মাধ্যমে কৃষি ব্যাংক, সমবায় ব্যাংক প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানকে ঋণ প্রদান করে থাকে।

৬। সরকার: বাংলাদেশ সরকার অনেক সময় কৃষকদেরকে সরাসরি ঋণ প্রদান করে থাকে। সরকার প্রদত্ত এ সকল ঋণসমূহকে সরকারী ঋণ বলে। দুর্ভিক্ষ, বন্যা, খরা প্রভৃতি দুর্যোগের সময় দরিদ্র কৃষকেরা যাতে বীজ সার গরু, কীটনাশক ওষুধ পত্র ক্রয় করতে পারে সেজন্য সরকার সরাসরি ঋণ প্রদান করে থাকে। এ ঋণের সুদের হার কম এবং পরিশোধ করার শর্তও সহজ।

৭। সমন্বিত পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচি: সমন্বিত পল্লী উন্নয়ণ কর্মসূচির মাধ্যমে কৃষকদেরকে ঋণ প্রদান করা হয়। এ সংস্থা কৃষকদেরকে সার, বীজ, কীটনাশক, ঔষধ ও কৃষি যন্ত্রপাতি ক্রয় করার জন্য ঋণ প্রদান করে থাকে।

৮। গ্রামীণ ব্যাংক: গ্রামীণ ব্যাংক বাংলাদেশের দরিদ্র ও ভূমিহীন কৃষকদের জামানতবিহীন ঋণ দান করে থাকে। এর ফলে আত্মকর্মসংস্থানমূলক উৎপাদনশীল কর্মকান্ডে মূলধন যোগান যেমন সহজ হয়েছে তেমনি দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আয়, কর্মসংস্থান ও সঞ্চয় বৃদ্ধির মাধ্যমে অর্থনৈতিক বৈষম্য দূর করা সম্ভবপর হচ্ছে।

কৃষি ঋণের সমস্যার সমাধান

বাংলাদেশে কৃষি ঋণের দ্রুত উন্নয়নের জন্য সহজ শর্তে পর্যাপ্ত পরিমাণ কৃষিঋণ প্রয়োজন। বাংলাদেশের কৃষি ঋণের সমস্যার সুষ্ঠু সমাধানের জন্য নিম্নলিখিত ব্যবস্থা গ্রহন করা যেতে পারে:

১. **ঋণ দানের ক্ষেত্রে জটিলতা অপসারণ:** কৃষি ঋণদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের ঋণদান পদ্ধতি সহজ ও সরল হওয়া বাঞ্ছনীয়। এ উদ্দেশ্যে জামানতের করাকরি শিথিল করতে হবে। ঋণদানের অযথা কালক্ষেপণের প্রবণতা দূর করতে হবে।

২. **অধিক সংখ্যক সমবায় ঋণদান সমিতি স্থাপন ও পুনর্গঠন:** কৃষিঋণের যোগান বৃদ্ধি করার উদ্দেশ্যে গ্রামে গ্রামে সমবায় ঋণদান সমিতি গঠন করতে হবে। সমবায় ঋণদান সমিতিকে অধিকতর কার্যকর করার জন্য সমিতিগুলোর ঋণ প্রদান ক্ষমতা বাড়াতে হবে। গ্রামের টাউটদের জন্য সমিতির দার রুদ্ধ করতে হবে, কর্মচারীদের দুর্ণীতিমুক্ত হতে হবে ও জনগনের মধ্যে সমবায়ী মনোভাব জাগাতে হবে।

৩. **কৃষি ঋণের সুষ্ঠু ব্যবহারের নিশ্চয়তা বিধান:** কৃষি ঋণ যাতে অনুৎপাদনশীল সামাজিক আচার অনুষ্ঠানে ও অন্যান্য কাজে ব্যবহার না হয় সেজন্য সুষ্ঠু তদারকির ব্যবস্থা গ্রহন করতে হবে। কৃষি ঋণ অবশ্যই কৃষির উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য ব্যবহার করতে হবে। এ সম্পর্কে ঋণদাতা প্রতিষ্ঠান ও ঋণ গ্রহিতাদের মধ্যে সঠিক ধারণা থাকা প্রয়োজন।

৪. **আমলাতান্ত্রিক মনোভাব পরিহার:** কৃষি ঋণদানকারি প্রতিষ্ঠানের কর্মচারীদের আমলাতান্ত্রিক মনোভাব পরিহার করে সেবার মনোভাব প্রসার করতে হবে। কর্মচারীদের আমলাতান্ত্রিকতা এত চরমে উঠেছে যে, সাধারণ ও অশিক্ষিত কৃষকের ক্ষেত্রে ঋণগ্রহন করা প্রায় দুঃসাধ্য।

৫. **সময়মত ঋণ পরিশোধের ব্যবস্থা:** সময়মত গ্রহীতার ঋণ পরিশোধ সম্পর্কে কার্যকর প্রদক্ষেপ গ্রহন করা প্রয়োজন। এর জন্য প্রয়োজনীয় কর্মচারীদের ঋণের ব্যবহার সম্পর্কে তদারকির ব্যবস্থা করা, প্রকৃত কৃষকদের কৃষি ঋণ প্রদানের ব্যবস্থা করা এবং কৃষি ঋণের উদ্দেশ্য ও এর ব্যবহার সম্পর্কে কৃষকদেরকে পরামর্শ প্রদান করা। এতে কৃষি ঋণের যথাযথ ব্যবহার হবে। কৃষকদের আয় বাড়বে এবং কৃষি ঋণ পরিশোধ করা ঋণগ্রহীতার পক্ষে সহজ হবে।

৬. **ঋণদান প্রতিষ্ঠানের ঋণ প্রদান ক্ষমতা বৃদ্ধি:** যে সব প্রতিষ্ঠান কৃষি ঋণ প্রদান করে তারা যাতে কৃষকদের চাহিদা অনুযায়ী ঋণপ্রদান করতে পারে সে জন্য ঐ সব প্রতিষ্ঠানে পর্যাপ্ত মূলধন থাকা প্রয়োজন। এ ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংক ও সরকার আরও সক্রিয় ভূমিকা পালন করে ঐ সব প্রতিষ্ঠানের ঋণ প্রদান ক্ষমতা বৃদ্ধি করতে হবে।

৭. **সুষ্ঠু ঋণ নীতিমালা:** কৃষি ঋণ ব্যবস্থার ক্রটিসমূহ দূর করে সুষ্ঠু কৃষি ঋণ নীতি প্রণয়ন করা প্রয়োজন এবং সে নীতিমালা সকল ঋণপ্রদান সংস্থার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হতে হবে।

৮. **দুর্নীতি ও স্বজনপ্রীতি রোধ:** প্রকৃত কৃষকেরা কৃষির উৎপাদন বাড়ানোর জন্য যাতে কৃষি ঋণ পেতে পারে সে জন্য কৃষি ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে দুর্নীতি ও স্বজনপ্রীতির মূল উৎপাটন করতে হবে। দুর্ণীতি ও স্বজনপ্রীতি রোধে প্রয়োজনে কঠোর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহন করতে হবে।

৯. **গ্রামাঞ্চলে অধিক সংখ্যক ঋণদানকারী ব্যাংকসমূহের শাখা স্থাপন:** কৃষি ঋণ সমস্যা সামাধানের জন্য গ্রামাঞ্চলে অধিক সংখ্যাক কৃষি ঋণদানকারী ব্যাংকসমূহের শাখা স্থাপন করতে হবে। এতে কৃষকগণ অতিসহজে ও অনায়াসে ঋণ সংগ্রহ করতে পারবে এবং কৃষি ঋণ গ্রহনের জন্য আগ্রহী হবে।

১০. **প্রাতিষ্ঠানিক উৎসের উপর নির্ভরশীলতা হ্রাস:** অপ্রাতিষ্ঠানিক উৎস থেকে কৃষকদের ঋণ গ্রহনের আগ্রহ কমতে হবে এবং এজন্য বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানিক উৎস হতে যাতে কৃষকেরা সহজ শর্তে প্রয়োজন মত ঋণ পেতে পারে তার ব্যবস্থা করতে হবে। এ উদ্দেশ্যে গ্রামে গ্রামে অধিক সংখ্যক কৃষি ঋণদানকারী প্রতিষ্ঠানের শাখা খুলতে হবে।

১১. **জামানতের শর্ত শিথিল:** কৃষি ঋণের সুযোগ-সুবিধা যাতে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকেরা পেতে পারে সেজন্য কৃষি ঋণের জামানতের শর্ত শিথিল করা প্রয়োজন। কারণ বাংলাদেশের অধিকাংশ কৃষক দরিদ্র। ঋণ গ্রহনের জন্য প্রয়োজনীয় জামানত দেয়ার সম্পদ অধিকাংশ কৃষকেরই নেই।

১২. সুদের হার নির্ণয়: অপ্রাতিষ্ঠানিক উৎস হতে কৃষকদের প্রাপ্ত ঋণের সুদের হার সরকার কর্তৃক কড়াকড়িভাবে নিয়ন্ত্রিত হওয়া উচিত। গ্রাম্য মহাজন,ব্যবসায়ী ও ধনী ব্যক্তিদের ঋণদান কার্যাবলি সরকারি নিয়ম-কানুনের আওতায় আনার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহন করতে হবে।

১৩. মহাজনী শোষণের বিরুদ্ধে আইন প্রণয়ন: গ্রাম্য মহাজন ও জোতদারগণ ঋণের নামে যাতে দরিদ্র কৃষকদের জমি আত্মসাৎ কিংবা অত্যাচার ও শোষণ করতে না পারে সেজন্য এদের স্বার্থ রক্ষার জন্য আইন প্রণয়ন করা প্রয়োজন। এসব ব্যবস্থা গ্রহনের মাধ্যমে বাংলাদেশের কৃষকদের কৃণিঋণ সমস্যার সমাধান দেয়া সম্ভব।

১৪. উৎপাদন বৃদ্ধি: কৃষি উৎপাদন বাড়ালে কৃষকদের ঋণের প্রয়োজন কমবে। ফলে কৃষকদের ঋণ সমস্যার অনেকটা সমাধান হবে।

বাংলাদেশে কৃষি ঋণ বিতরণে বিভিন্ন কর্মসূচী

কৃষি ঋণ বিতরণ কর্মসূচি: বাংলাদেশের কৃষকদের বেশিরভাগই দরিদ্র। তারা কৃষি-উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় বিনিয়োগ করতে পারে না।এজন্য তাদের প্রয়োজন মাফিক, সময়মতো ও সহজে ঋণ পাওয়া আবশ্যক। এ আবস্থার প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ সরকার কৃষি ঋণ সুবিধা প্রদানের জন্য সিম্লোক্ত বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহন করেছে:

১. ঋণের অপ্রাতিষ্ঠানিক উৎসগুলো ঋণগ্রহীতা কৃষকদেরকে যাতে অযথা হয়রানি কিংবা শোষণ করতে না পারে সেজন্য সরকার একটি জাতীয় ঋণ সালিশ বোর্ড গঠন করেছে। এ বোর্ড ঋণদাতা ও ঋণগ্রহীতাদের মধ্যে আপস-মীমাংসা করে।
২. কৃষি উৎপাদনে বিনিয়োগের স্বল্পতা দূর করার জন্য সরকার বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক ও রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করেছে। এগুলোর মাধ্যমে মাঝারি সুদের হারে কৃষকদেরকে স্বল্প, মধ্যম ও দীর্ঘমেয়াদি ঋণ প্রদান করা হয়। এছাড়া নগদ তহবিল সরবরাহের মাধ্যমে সরাকার ৪ টি রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোকে কৃষি ঋণদান কার্যক্রমের সাথে জড়িত করেছে।
৩. সরকার কৃষি ঋণবিতরণ সহজতার করার লক্ষ্যে বর্ধিত কলেবরে কৃষি/পল্লী ঋণ নীতিমালা ও কর্মসূচি প্রণয়ন করেছে। ঋণ বিতরণ প্রক্রিয়া সহজতর করার জন্য নীতিমালায় নতুন নতুন বিষয় সন্নিবেশিত হচ্ছে।
৪. সকল ব্যাংকের কার্যকর অংশগ্রহণের মাধ্যমে কৃষিঋণের পরিমান ও আওতা বাড়ানো এবং পল্লী এলাকায় ব্যাংকিং কর্মকান্ডের সম্প্রসারণের কৌশলগত পদ্ধতি অবলম্বন করা হচ্ছে।
৫. প্রান্তিক পর্যায়ে কৃষকদের কথা চিন্তা করে সরকার ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশনের আওতায় জামানতবিহীন ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি চালু করেছে।
৬. আমদানি বিকল্প শস্য চাষে শতকরা ৪ ভাগ রেয়াতি সুদের হারে ঋণ প্রদান করা হচ্ছে।

কৃষি উপকরণ বিতরণের বিভিন্ন কর্মসূচী:

কৃষি উৎপাদন বাড়ানোর জন্য সকল প্রয়োজনীয় উপকরণ পর্যাপ্ত পরিমাণে ও নিয়মিত যোগান একান্ত প্রয়োজন। দারিদ্র ও অজ্ঞতার কারণে এক্ষেত্রে এদেশের কৃষকেরা অনেক পিছিয়ে আছে। তাই এ ব্যাপারে সরকাররেই আগ্রহী ভূমিকা পালন করতে হয়। বিভিন্ন কৃষি উপকরণ উপযুক্ত দাম ও প্রয়োজনীয় পরিমাণে বিতরণের জন্য সরকারের ব্যাপক কর্মসূচি রয়েছে:

১. কৃষি উপকরণে ভর্তুকি প্রদান

জনস্বার্থ রক্ষা ও জনকল্যাণ বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের উৎপাদন ব্যয়ের অংশবিশেষ সরকার কর্তৃক বহন করা ভর্তুকি বলে বিবেচিত হয়। এমনটি করা হলে সংশ্লিষ্ট দ্রব্যটির দাম কম থাকে। বাংলাদেশে বিভিন্ন কৃষি উপকরণ যেমন কৃষি যন্ত্রপাতি, সার ইত্যাদি কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য একান্ত প্রয়োজন। কিন্তু এসব উপকরণের দাম বেশি থাকায় এদেশের দরিদ্র কৃষকেরা সেগুলো প্রয়োজন মাফিক সংগ্রহ ও ব্যবহার করতে পারে না। ফলে উৎপাদন ও আয় কম হয়। তাই সরকার এসব উপকরণ উৎপাদনের ক্ষেত্রে ভর্তুকি প্রদান করে যাতে সেগুলোর দাম সাধারণ কৃষকদের ক্রয়ক্ষমতার মধ্যে থাকে এবং তারা সহজেই সেগুলো ব্যবহার করতে পারে। সার ও অন্যান্য কৃষি উপকরণের জন্য ২০১১-১২ অর্থবছরের বাজেট ৬,৫০০ কোটি টাকা বরাদ্ধ রাখা হয়।

২. কৃষি উপকরণ সহজলভ্যকরণ

মানসম্মত/উচ্চ ফলনশীল বীজ কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির অন্যতম প্রধান উপকরণ। অধিক পরিমাণে মানসম্মত/উচ্চ ফলনশীল বীজ উৎপাদন ও কৃষকদের নিকট সরবরাহের মাধ্যমে ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি সম্ভব। এ ধরনের বীজ উৎপাদনের জন্য সরকার দেশে ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট,কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট,পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট, ইত্যাদি সংস্থাপন করে। এসব ইনস্টটিউট ধান,গম,আলু,শাক-সবজি, ডাল, তেল-বীজ ইত্যাদির উন্নত মানের বীজ উদ্ভাবন করে।

উন্নত মানের বীজ উৎপাদন,বর্ধন,প্রক্রিয়াজাতকরণ,সংরক্ষণ এবং সরবরাহের দায়িত্ব বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন করপোরেশন এর উপর ন্যাস্ত করা হয়েছে। বি.এ.ডি.সি সারা দেশে ২৩টি দানা শস্য বীজ, ২টি পাট বীজ, ২টি আলু বীজ, ৩টি ডাল ও তৈলবীজ ও ২টি সবজি বীজ উৎপাদন খামার পরিচালনা করেছে; তাছাড়া ৭৫টি চুক্তিবদ্ধ চাষী জোনের মাধ্যমে বীজউৎপাদন কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে মানসম্মতবীজ সহজলভ্য করার জন্য 'সার্ক সীড ব্যাংক' প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। বিএডিসি ৯টি উদ্যান উন্নয়ন কেন্দ্র ও ১২টি এগ্রো-সার্ভিস সেন্টারের মাধ্যমে উৎপাদিত বিভিন্ন ফসলের চারা,কলম,গুটি ইত্যাদি উৎপাদন ও চাষি পর্যায়ে বিতরণ কার্যক্রম পরিচালনা করছে। বীজ উৎপাদন ও বিতরণের এ প্রক্রিয়ায় সরকার ভর্তূকি প্রদান করায় তা কম দামে কৃষকদের মধ্যে বিতরণ করা সম্ভব হয়। নিচের সারণিতে বিগত কয়েক বছরে প্রধান কয়েকটি কৃষিপণ্যের বীজ বিতরণ পরিস্থিতি তুলে ধরা হলো:

(বি.এ.ডি.সি এর বীজ বিতরণ মেট্রিক টনে)

বীজের নাম	২০১১-১২	২০১২-১৩	২০১৩-১৪(লক্ষ্যমাত্রা)
ধান বীজ	৯১৮২১	৮৫১১৯	৮৬০০৮
গম বীজ	২৭৩০৪	১৮৮৫২	২৭০০০
ভুট্টা বীজ	২৯৬	১৮৪	৩০০
আলু বীজ	২০৪৪২	১৯৩২২	২৩০৪৫
ডাল বীজ	১৪২৬	১৬৯৯	২১৬১
তৈল বীজ	১০৯২	১৪৬৯	১৯৫২
পাট বীজ	১৫৮৯	১০৯৪	১৭৫৬
সবজি বীজ	১২০	১২৬	১২৬
মসলাজাতীয় বীজ	১০৭	১০৩	১২৫
সর্বমোট	**১৪৪১৯৭**	**১২৭৯৬৮**	**১৪২৪৬৩**

শস্য উৎপাদন বাড়ানোর ক্ষেত্রে সার বিশেষ করে কৃত্রিম সার ব্যবহারের বিকল্প নেই। সরকার কৃষি খাতে সারের ক্রমবর্ধমান চাহিদা পূরণের জন্য নিজ উদ্যোগে প্রধানত ইউরিয়া ও টিএসপি সার উৎপাদন করে। পরে এর ওপর ভর্তূকি দিয়ে উৎপাদন ব্যয়ের চেয়ে কম দামে কৃষকদের কাছে বিক্রি করে। তাছাড়া টিএসপি,ডিএসপি ও এমওপি সারের আমদানির ওপর শতকরা ২৫ ভাগ হারে ভর্তূকি দেওয়া হয় যাতে এগুলো দরিদ্র কৃষকেরাও প্রয়োজন-মাফিক ক্রয় করতে পারে। নিচে বিগত কয়েক বছরে বাংলাদেশে সার ব্যবহারের একটি সারণি দেওয়া হলো:

অর্থবছর	ব্যবহৃত সারের পরিমাণ
২০০৯-১০	৩৩.১৩
২০১০-১১	৪০.৮৫
২০১১-১২	৪০.৪৯
২০১২-১৩	৪১.৩৩

৩. কৃষি উপকরণ সহায়তা কার্ড

বাংলাদেশে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের জন্য সরকার বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহন করেছে। এসবের মাধ্যমে সম্প্রতি গৃহিত কৃষি উপকরণ সহায়তা কার্ড কর্মসূচি অন্যতম। এ কর্মসূচির অধীনে প্রান্তিক (২.০২-০.১৯ হেক্টের জমির মালিক), ক্ষুদ্র (০.২০-১.০০ হেক্টর জমির মালিক) এবং মাঝারি (১.০১-৩.০৩ হেক্টর জমির মালিক) কৃষকদেরকে ব্যাংক মারফত নগদ অর্থ ভর্তূকি হিসেবে প্রদান করা হয়। প্রয়োজনীয় বিভিন্ন কৃষি উপকরণ ক্রয়ের জন্য এ আর্থিক সহায়তা দেওয়া হয়। ইউনিয়ন পরিষদ কর্তৃক নির্বাচিত উল্লিখিত তিন শ্রেণির কৃষকদেরকে এ সুবিধার আওতায় আনা হয়।

কৃষি উপকরণ সহায়তা কার্ড কর্মসূচিতে নগদ আর্থিক সহায়তা গ্রহন এবং আর্থিক লেনদেন পরিচালনার জন্য কৃষকদেরকে ব্যাংকে কেবলমাত্র ১০ টাকা জমা দিয়ে একটি হিসাব খুলতে হয়। এক্ষেত্রে ব্যাংকে নূন্যতম নগদ অর্থ জমা রাখার বিধান প্রযোজ্য হয় না। তাছাড়া হিসাব খোলার জন্য গ্রাহকদেরকে শনাক্তকরণেরও প্রয়োজন পড়ে না। এখানে আর্থিক সুবিধা গ্রহনের জন্য কৃষকদেরকে যে কার্ড দেওয়া হয় তাই তাদের চূড়ান্ত পরিচয়পত্র হিসেবে গণ্য হয়। কার্ডে আর্থিক সহায়তা প্রদানের যে বিবরণ থাকে তাতে সংশ্লিষ্ট কৃষকেরা বীজ, কৃষিঋণ, সার ও অন্যান্য কৃষি উপকরন এবং কৃষি পুনর্বাসনের সুবিধাও পাওয়ার অধিকারী হয়।

প্রাথমিকভাবে সর্বপ্রথম ২০০৯-২০১০ সালে বোরো ধান উৎপাদনে নিয়োজিত ১ কোটি চাষীকে অগভীর নলকূপের সাহায্যে পানি সেচের জন্য ডিজেল ক্রয়বাবদ নগদ অর্থ সহায়তা দেয়া হয়। এক্ষেত্রে প্রান্তিক ও ক্ষুদ্র কৃষকদেরকে মাথাপিছু ৮০০ টাকা এবং মাঝারি কৃষকদেরকে ১০০০ টাকা নগদ অর্থ সহায়তা দেওয়া হয়। খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের প্রক্রিয়া জোরদার করার জন্য পরবর্তী বছরগুলোতেও এ কার্যক্রম অব্যাহত রাখা হয়েছে।

উপকরণ সহায়তা কার্ড দেশে খাদ্যশস্যের উৎপাদন বৃদ্ধি ও কৃষকদের বৈষয়িক কল্যান সাধনের ক্ষেত্রে একটি প্রশংসনীয় উদ্যোগ এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

শিক্ষার্থীর কাজ

১। বাংলাদেশে কৃষি ঋণের প্রয়োজনীয়তা এবং কৃষি ঋণ বিতরণের উপযোগীতা বিশ্লেষণ করুন।
২। বাংলাদেশের কৃষি ঋণের উৎস এবং কৃষি ঋণ সমস্যার সমাধান কি করে করবেন বর্ণনা করুন।
৩। বাংলাদেশের কৃষি উপকরণ বিতরনের বিভিন্ন কর্মসূচী বর্ণনা করুন।

সারসংক্ষেপ

- সুষ্ঠুভাবে কৃষিকাজ পরিচালনা করতে হলে উন্নত ধরনের কৃষি যন্ত্রপাতি, বীজ, সার প্রভৃতি একান্ত প্রয়োজন, কিন্তু সর্বনাশা দারিদ্র্যের কারনে বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশের কৃষক কৃষির উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় মূলধন সংগ্রহ করতে পারে না। ফলে তাকে ঋণের উপর নির্ভর করতে হয় কিন্তু কৃষি ঋণের প্রকৃতি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, গ্রাম্য মহাজনের কৃষকদের চিরস্থায়ী দারিদ্রের সুযোগে তাদেরকে যুগ যুগ ধরে শোষন করছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ২.৫

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। কৃষি ঋণের উৎসকে কয়টি শ্রেণিতে ভাগ করা হয়?
ক) ৪টি খ) ৩টি গ) ২টি ঘ) ৫টি

২। ভূমি বন্ধকী ব্যাংক থেকে গৃহীত ঋণ কত বৎসরের মধ্যে পরিশোধ করতে হয়?
ক) ১০ বৎসর খ) ২০ বৎসর গ) ৫ বৎসর ঘ) ১৫ বৎসর।

৩। বাংলাদেশে রাষ্ট্রায়ত্ব বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো কত সাল থেকে কৃষি ঋণ প্রদান করছে?
ক) ১৯৭৫ খ) ১৯৮১ গ) ১৯৮৩ ঘ) ১৯৭৭

৪। বাংলাদেশের কৃষি ঋণের উৎসকে কয়ভাগে ভাগ করা যায়?
ক) দুইভাগে খ) তিনভাগে গ) চারভাগে ঘ) পাঁচভাগে

৫। কৃষি ঋণের প্রাতিষ্ঠানিক উৎস কোনগুলি?
i. আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু বান্ধব
ii. গ্রাম্য মহাজন
iii. বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

পাঠ ২.৬ শস্য বহুমুখীকরণ ও সেচ সুবিধা সম্প্রসারণ
Crops Diversification and Extension of Irrigation Facilities

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা-

- বাংলাদেশে কৃষি উন্নয়ন শস্য বহুমুখীকরন ও সেচ সুবিধা সম্প্রসারণের প্রভাব বর্ণনা করতে পারবেন।

মূলপাঠ

সম্প্রতি কৃষি উৎপাদন পদ্ধতিতে যে পরিবর্তনগুলো সূচিত হয়েছে তার মধ্যে শস্যের বহুমুখীকরণ অন্যতম। সনাতন পদ্ধতিতে চাষাবাদের ক্ষেত্রে একই জমিতে বার বার একই শস্য উৎপাদন করা হয়। যেমন বাংলাদেশের অধিকাংশ জমিতে বছরের পর বছর কেবল ধান চাষ করা হয়। বার বার একই শস্য উৎপাদন করার ফলে জমিস্থিত কয়েকটি নির্দিষ্ট রাসায়নিক উপাদান নিঃশেষ হতে থাকে। ফলে জমির উৎপাদিকা শক্তি হ্রাস পায়। এ অবস্থায় নির্দিষ্ট শস্যটির উৎপাদন কমে যায়। একই জমিতে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ফসল চাষাবাদকেই শস্য বহুমুখীকরণ বলে। যেমন, একই জমিতে ধান চাষের পর পাট ও তার পর ডাল চাষ করলে তা হবে শস্য বহুমুখীকরণ । এ জন্য বিভিন্ন রাসায়নিক উৎপাদন ব্যবহৃত হয় বলে জমিস্থিত রাসায়নিক উপাদানগুলোর মান বজায় থাকে। ফলে জমির উর্বরতা অক্ষুন্ন থাকে এবং উৎপাদন বৃদ্ধি পায়।

ফসল বহুমুখীকরনের সুবিধা

বাংলাদেশের কৃষিতে ফসল বহুমূখীকরণের নিম্নোক্ত সুবিধা রয়েছে:

১. **বিভিন্ন ফসল উৎপাদন:** ফসল বহুমুখীকরনের ফলে একই জমিতে বছরে একাধিকবার ভিন্ন ভিন্ন ফসল উৎপাদন করা যায়। কিন্তু একই জমিতে একই ফসল একাধিক বার উৎপাদন করা উচিত নয়।

২. **জমির উর্বরতা সংরক্ষণ:** ফসল বহুমুখীকরনের মাধ্যমে জমির ভবিষ্যত উৎপাদিকা শক্তি অক্ষুন্ন রাখা যায়। জমিতে বারবার কেবলমাত্র একটি ফসল উৎপাদন করা হলে ঐ ফসলের প্রয়োজনীয় সার নিঃশেষিত হয়ে যায়। এতে জমির ভবিষ্যত উৎপাদন ক্ষমতা হ্রাস পায়। কিন্তু ফসল বহুমুখীকরণের মাধ্যমে একটি জমিতে মালটি ফসল উৎপাদনের ব্যবস্থা করা হলে এই সমস্যা দূর হয়।

৩. **আগাছা নিয়ন্ত্রন:** ফসল বহুমুখীকরণের মাধ্যমে অপেক্ষাকৃত সহজে আগাছা নিয়ন্ত্রন করা যায়। ফসল বহুমুখীকরণের কারনে একই জমি বছরে কয়েকবার চাষকরা হয় বলে জমিতে আগাছা জন্মাতে পারে না। পক্ষান্তরে, জমিতে একটি মাত্র ফসল উৎপন্ন করা হলে উক্ত ফসল উঠার পর বছরের অবশিষ্ট সময় জমি পতিত পড়ে থাকে। ফলে জমিতে আগাছা জন্মে।

৪. **চাহিদা বৃদ্ধি:** বাংলাদেশে শুধুমাত্র ধান চাষ করা হলে বাজারে অন্য ফসলের চাহিদা মিটানো যাবে না। ফসল বহুমুখীকরণের মাধ্যমে কৃষিতে বিভিন্ন ঋতুতে বিভিন্ন ফসল উৎপাদিত হলে উৎপাদিত পণ্যগুলো পরস্পরের চাহিদা সৃষ্টি করবে। এতে কৃষি পণ্যের মোট চাহিদা বৃদ্ধি পাবে।

৫. **কর্মসংস্থান:** ফসল বহুমুখীকরণের সারা বছর বিভিন্ন ফসল উৎপন্ন হয় বলে কৃষক সারা বছরই কর্মরত থাকে। ফলে কর্মসংস্থান বৃদ্ধিপায় এবং কৃষকের শ্রম ও সময় অযথা নষ্ট হয় না।

৬. **ঝুঁকি হ্রাস:** ফসল বহুমুখীকরণের ফলে কৃষিতে বিভিন্ন রকম ফসল উৎপাদিত হয়। ফলে কোন কারনে একটি ফসলের ক্ষতি হলেও অন্য ফসল দ্বারা তার ক্ষতি পূরণ সম্ভব হয়। এতে কৃষকের ঝুঁকির পরিমান হ্রাস পায়।

৭. **সেচ ব্যবস্থার সর্বোত্তম ব্যবহার:** বিভিন্ন ফসলের জন্য জল সেচের প্রয়োজন হয়। ফসল বহুমুখীকরণের ফলে বিভিন্ন ফসলের জন্য বিভিন্ন সময়ে জল সেচের প্রয়োজন হবে। এতে সেচের যন্ত্রপাতি কখনও অকেজো থাকবে না এবং সেচ ব্যবস্থার দক্ষতম ব্যবহার সম্ভব হবে।

৮. **পরিবহন খরচ হ্রাস:** কৃষকের নিজেস্ব ভোগের জন্য বহু দ্রব্যের প্রয়োজন হয়। ফসল বহুমুখীকরণের ফলে কৃষক তার পরিবারের প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন দ্রব্য উৎপাদন করতে পারে। তাকে একটিমাত্র দ্রব্যের উদ্বত্তাংশ বিক্রি করে অন্যান্য দ্রব্য ক্রয় করতে হয় না। এতে পরিবহন খরচ বাঁচে।

৯. **পুষ্টির সংস্থান:** কৃষকের বিভিন্ন ফসল উৎপাদিত হলে সে তার খাদ্যে বিভিন্ন উপাদান গ্রহন করতে পারে। এতে কৃষকের সুষম ও পুষ্টি সমৃদ্ধ খাদ্য গ্রহনের সুযোগ সৃষ্টি হয়।

১০. **আয় বৃদ্ধি:** ফসল বহুমুখীকরণ কৃষকের আয় বৃদ্ধি করে। জমিতে একটি মাত্র ফসল উৎপাদিত হলে কৃষকের এক বছরে একবার মাত্র আয় প্রাপ্তি ঘটে। পক্ষান্তরে ফসল বহুমুখীকরণের ফলে কৃষক সারা বছরই একের পর এক ফসল পেতে থাকে। এতে কৃষকের আয় বৃদ্ধি পায়।

১১. **একঘেয়েমী হ্রাস:** ফসল বহুমুখীকরণের ফলে জমিতে সারা বছর বিভিন্ন ধরনের ফসল উৎপন্ন হয়। ফলে কৃষক বার বার একই ফসল উৎপাদন করার ক্লান্তিকর একঘেয়েমির হাত থেকে রক্ষা পায়।

ফসল বহুমূখীকরণের সীমাবদ্ধতা:

ফসল বহুমূখীকরণের কিছু সীমাবদ্ধতা রয়েছে। তা সংক্ষেপে আলোচনা করা করা হল:

১. প্রযুক্তি সীমাবদ্ধতা
২. জমির গুনাগুন
৩. শ্রম ও যন্ত্রপাতির প্রাপ্যতা
৪. নৈপুণ্য হ্রাস

১. **প্রযুক্তি সীমাবদ্ধতা:** একটি মাত্র ফসলের জন্য গবেষণার মাধ্যমে নবতর প্রযুক্তি যতটা সহজ বহুফসলের ক্ষেত্রে ততটা সহজ নয়। ফলে কৃষিতে একই জমিতে বিভিন্ন ধরনের ফসলের ক্ষেত্রে প্রযুক্তিগত উৎকর্ষ সমাধান খানিকটা সীমাবদ্ধ।

২. **জমির গুনাগুন:** সকল অঞ্চল সকল দ্রব্য উৎপাদনের জন্য সমান উপযোগী নয়। কোন অঞ্চলের মাটি ও জলবায়ু কোন একটি বিশেষ ফসলের উপযোগী হতে পারে। যেমন বরিশালের তুলনায় ময়মনসিংহ অঞ্চলের জলবায়ু ও মাটি পাট চাষের জন্য অধিকতর উপযোগী। সুতরাং সকল দ্রব্য উৎপাদনের চেষ্টা না করে যে অঞ্চলের মাটি যে ফসলের উপযোগী সে অঞ্চলে সে সকল উৎপাদন করা উচিত। এতে কৃষির মোট উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে।

৩. **শ্রম ও যন্ত্রপাতির প্রাপ্যতা:** জমিতে একটি মাত্র ফসল উৎপাদন করা হলে সে ফসলের উপযোগী শ্রম ও যন্ত্রপাতি সংগ্রহ করা সহজতর হয়। পক্ষান্তরে, একই জমিতে যদি বিভিন্ন ফসল উৎপাদন করা হয় তবে তাদের জন্য প্রয়োজনীয় বিভিন্ন ধরনের শ্রম ও যন্ত্রপাতি সংগ্রহ করা কষ্টসাধ্য হয়ে পরে।

৪. **নৈপুণ্য হ্রাস:** কোন একজন কৃষক কেবলমাত্র একটি দ্রব্য উৎপাদনে নিয়োজিত থাকলে উক্ত দ্রব্য উৎপাদনে সে বিশেষ নৈপুণ্য লাভ করে। পক্ষান্তরে, একজন কৃষকের পক্ষে বিভিন্ন ফসল উৎপাদনে নৈপুণ্য লাভ করা দুঃসাধ্য। ফলে ফসল বহুমুখীকরণের ফলে অনেক ক্ষেত্রে কৃষকের দক্ষতার অভাবে উৎপাদন ব্যয় বেশি পড়ে।

তবে উপরে উপরে উল্লেখিত সীমাবদ্ধতাগুলো কৃষির আধুনিকীরণ ও যান্ত্রিকীকরনের মাধ্যমে সমাধান করা সম্ভব।

সেচ সুবিধা সম্প্রসারণের প্রভাব

পানি উদ্ভিদের প্রাণ স্বরূপ। সুতরাং দেশের কৃষি ব্যবস্থা মূলত শস্যক্ষেত্রে নিয়মিত পানি সরবরাহের উপর নির্ভরশীল। কিন্তু উপযুক্ত সেচ ব্যবস্থার অভাবে আমরা পানির জন্য বৃষ্টিপাতের উপর নির্ভর করি। আমাদের দেশে বৃষ্টিপাত মৌসুমী বায়ুর উপর নির্ভরশীল। কিন্তু মৌসুমী বায়ুর উপর মানুষের কোন হাত নেই। মৌসুমী বায়ু একান্তভাবেই প্রকৃতির খেয়ালের উপর নির্ভর করে। সুতরাং প্রকৃতির উপর নির্ভরশীলতা হ্রাস করে আমাদের কৃষি উৎপাদন বাড়াতে হলে সেচ ব্যবস্থার দ্রুত উন্নয়ণ একান্ত অপরিহার্য। নিম্নে বাংলাদেশে অর্থনীতিতে পানি সেচের গুরুত্ব আলোচনা করা হল:

১. **জীবনযাত্রার মান উন্নয়ণ:** উপযুক্ত সেচ ব্যবস্থা গ্রহনে কৃষির ফলন বৃদ্ধি পায়। এতে কৃষকের আর্থিক স্বচ্ছলতা বাড়ে ও তাদের জীবনযাত্রার মান উন্নত হয়।

২. **জাতীয় আয় বৃদ্ধি:** বাংলাদেশের জাতীয় আয়ের প্রায় **৩১** শতাংশ কৃষি থেকে পাওয়া যায়। সেচ ব্যবস্থা গ্রহনের মাধ্যমে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি পেলে দেশের জাতীয় আয় বৃদ্ধি পাবে।

৩. **বিভিন্ন প্রকার শস্যের চাহিদা মিটান:** সকল প্রকার শস্য উৎপাদনে পানির প্রয়োজন একরূপ নয়। যেমন-আমন ধানের জন্য প্রচুর পরিমানে পানির প্রয়োজন হয়। কিন্তু ইরি ও বোরো ধানের ক্ষেত্রে শুধু যে পানির প্রয়োজন হয় তাই নয় এ সমস্ত শস্যের ক্ষেত্রে দীর্ঘদিন যাবত মাঠে পানি ধরে রাখার প্রয়োজন হয়। সুতরাং বিভিন্ন শস্যের এরূপ চাহিদা মিটানো প্রাকৃতিক বৃষ্টিপাতের দ্বারা সম্ভব নয়। ফলে সেচ কার্য অপরিহার্য হয়ে পরে।

৪. **প্রকৃতির উপর নির্ভরশীলতা হ্রাস:** কৃষির জন্য বৃষ্টিপাতের উপর নির্ভর থাকা অত্যন্ত বিপজ্জনক। কারণ বৃষ্টিপাত প্রকৃতির খেয়াল এর উপর নির্ভর করে। সময়মত মৌসুমী বায়ুর আবির্ভাব ঘটলে দেশে ফসল ভাল হয় । কিন্তু অনেক সময় মৌসুমি বায়ু দেরিতে আসার ফলে অনাবৃষ্টি দেখা দেয় এবং কৃষি ব্যবস্থা মারাত্মক বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়। এই অনিশ্চয়তার হাত থেকে রক্ষা পেতে হলে সচে ব্যবস্থার সুবন্দোবস্ত করা একান্ত দরকার। কৃষিভিত্তিক বাংলাদেশে সেচ ব্যবস্থার সুষ্ঠু উন্নয়নের মাধ্যমে আমরা প্রকৃতির হাত থেকে আমাদের সৌভাগ্যের চাবিকাঠি ছিনিয়ে আনতে পারি।

৫. **জমির উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি:** আমাদের দেশে জনসংখ্যা অত্যন্ত দ্রুত গতিতে বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলে ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার চাপে আমাদের দেশে প্রতিবছরই প্রতিত জমি উদ্ধার এবং কর্ষিত জমির উৎপাদিক শক্তি বৃদ্ধি করার প্রয়োজনীয়তা বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই উদ্দেশ্য বাস্তবায়িত করতে হলে দেশে পর্যাপ্ত সেচ ব্যবস্থার উন্নয়ন একান্ত অপরিহার্য।

৬. **একাধিক ফসল উৎপাদন:** বাংলাদেশের মোট আবাদি দুই-তৃতীয়াংশ জমিতে বছরে মাত্র একটি ফসল উৎপাদন করা হয়। কিন্তু উপযুক্ত পানিসেচ ব্যবস্থা প্রবর্তন করা গেলে এই জমিতে বছরে দু'ই বা ততোধিক ফসল উৎপাদন করা সম্ভব।

৭. **গমের চাষ:** বাংলাদেশে খাদ্য তালিকায় বর্তমানে গম একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন। আমাদের খাদ্যাভাব দূর করতে হলে দেশে অবশ্যই গমের উৎপাদন বৃদ্ধি করতে হবে। কিন্তু গম একটি শীতকালীন ফসল। পানিসেচ ছাড়া গমের চাষ সম্ভব নয়। সুতরাং দেশে গমের চাষবৃদ্ধি করতে হলে সেচ সুবিধার সম্প্রসারণ একান্ত অপরিহার্য।

৮. **পানি নিষ্কাশন:** বাংলাদেশের নেত্রকোণা,কিশোরগঞ্জ ও সিলেট হাওর এলাকায় হাজার হাজার হেক্টর জলমগ্ন জমি পতিত পরে আছে। যান্ত্রিক উপায়ে পানি সেচের মাধ্যমে পানি নিষ্কাশন করে এই সব জমি চাষের আওতায় আনা যায়।

৯. **শীতকালীন ফসল:** শীতকালে আমাদের দেশে বৃষ্টিপাত হয় না। এই সময় আমাদের দেশে সাধারণত কোনরূপ প্রাকৃতিক দুর্যোগও থাকে না। সুতরাং উপযুক্ত সেচ ব্যবস্থার মাধ্যমে শীতকালে প্রচুর শস্য উৎপাদন করা সম্ভব।

১০. **পার্শ্ব জীবিকার সৃষ্টি:** উন্নত সেচ ব্যবস্থা কৃষকদের জন্য পার্শ্ব-জীবিকার ব্যবস্থা করতে পারে। উন্নত ধরনের সেচব্যবস্থা প্রবর্তন করতে বহু লোকের প্রয়োজন হয়। ফলে সেচ ব্যবস্থা দরিদ্র কৃষকদের জন্য পার্শ্ব -জীবিকার সৃষ্টি করে তাদের মাথাপিছু আয় বৃদ্ধিতে সহায়ক হবে এবং তাদের জীবন উন্নত হবে।

শিক্ষার্থীর কাজ

১। ফসল বহুমুখীকরনের সুবিধাসমূহ ব্যাখ্যা করুন।
২। কৃষিতে সেচ সুবিধা সম্প্রসারণের প্রভাব বর্ণনা করুন।

সারসংক্ষেপ

- আধুনিক চাষাবাদে একই জমিতে ধান চাষের পর পাট ও ডাল চাষ করা হয়। এজন্য বিভিন্ন রাষায়নিক উৎপাদন গুলোর মান বাজায় থাকে না। প্রাকৃতির উপর নির্ভরশীলতা হ্রাস করে দেশের উৎপাদন বাড়াতে হলে সেচব্যবস্থার দ্রুত উন্নয়ন একান্ত প্রয়োজন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ২.৬

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। ফসল বহুমুখী করনের সুবিধাগুলো কী কী?

i. বিভিন্ন ফসল উৎপাদন
ii. জমির উর্বরতা সংরক্ষণ
iii. কর্মসংস্থান
নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii　খ) i ও iii　গ) ii ও iii　ঘ) i, ii ও iii

২। সেচ সুবিধা সম্প্রসারণের ফলে

i. জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন হয়
ii. বিভিন্ন প্রকার শস্যের চাহিদা বাড়ে
iii. জাতীয় আয় বৃদ্ধি পায়
নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii　খ) i ও iii　গ) ii ও iii　ঘ) i, ii ও iii

৩। বাংলাদেশের জাতীয় আয়ের কত শতাংশ কৃষি থেকে আসে?

ক) ৩১　খ) ৩৩　গ) ৩০　ঘ) ২৮

৪। বাংলাদেশের কোন এলাকার মাটি পাট চাষের জন্য বেশি উপযোগী?

ক) বরিশাল　খ) ময়মনসিংহ　গ) চট্টগ্রাম　ঘ) খুলনা

৫। বাংলাদেশের হাওড় এলাকা কোনগুলো?

ক) নরসিংদী, চাঁদপুর　খ) কিশোরগঞ্জ, সিলেট　গ) দিনাজপুর, রংপুর　ঘ) মাগুড়া, নওগাঁ

পাঠ ২.৭ আধুনিক কৃষি ব্যবস্থা
Modern Agricultural System

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা-

- বাংলাদেশের কৃষি উন্নয়নে পারমানবিক শক্তি, বায়োটেকনোলজি পদ্ধতি এবং আইসিটি ব্যবহারের গুরুত্ব বিশ্লেষণ করতে পারবেন;
- বাংলাদেশে কৃষিতে উন্নত-বীজের উদ্ভাবনের প্রভাব মূল্যায়ন করতে পরিবেশ দূষণ, বৈশ্বিক উষ্ণতা ও জলবায়ু পরিবর্তন জনিত পরিস্থিতির সাথে অভিযোজনের উপায় বর্ণনা করতে পারবেন।

মূলপাঠ

বাংলাদেশের কৃষির উন্নয়নে পারমানবিক শক্তি বায়োটেকনোলজি পদ্ধতি এবং আইসিটি ব্যবহারের গুরুত্ব

কৃষিতে পারমানবিক পদ্ধতি/প্রযুক্তি ব্যবহৃত হচ্ছে তার মধ্যে পারমানবিক ও বায়োটেকনোলজি পদ্ধতি/প্রযুক্তি অন্যতম।

কৃষিতে পারমানবিক পদ্ধতি/প্রযুক্তি

কৃষিক্ষেত্রে পারমানবিক শক্তি বিকিরণকে নিয়ন্ত্রিত উপায়ে কাজে লাগানোই হলো পারমানবিক কৃষি পদ্ধতি/প্রযুক্তি। সুনির্দিষ্টভাবে বলতে গেলে, পারমানবিক প্রযুক্তির অধীনে তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ ব্যবহারের মাধ্যমে উদ্ভিদ ও প্রাণীর গুনগত, পরিমাণগত বা রূপগত পরিবর্তনকে কৃষিতে পারমানবিক পদ্ধতি/প্রযুক্তি বলে পরিচিত।

বায়োটেকনোলজি পদ্ধতি বা জৈব প্রযুক্তি

উদ্ভিদ, প্রাণী এবং অনুজীবের পরিমিত রূপান্তর ও মান উন্নীতকরণে যে বৈজ্ঞানিক কলাকৌশল ব্যবহার করা হয় তাই হলো বায়োটেকনোলজি পদ্ধতি বা জৈব প্রযুক্তি। এ প্রযুক্তির সাহায্যে বিদ্যমান উদ্ভিদ ও প্রাণী থেকে উন্নততর ও অধিক উৎপাদনক্ষম ধরনের উদ্ভিদ উৎপাদন ও প্রাণীর প্রজনন সম্ভব।

কৃষিতে পারমানবিক পদ্ধতির গুরুত্ব

১। **কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধিঃ** বর্তমানে বাংলাদেশে অতীতের তুলনায় কৃষি উৎপাদন বাড়লেও এখনও তা আশানুরূপ নয়। এ অবস্থায় সনাতন বীজের পরিবর্তে পারমানবিক বিকিরণের সাহায্যে প্রাপ্ত বীজের চাষ করা উচিত। এ বীজ অধিক উৎপাদনক্ষম হওয়ায় এর সাহায্যে চাষ করলে ভবিষ্যতে কৃষি উৎপাদন যথেষ্ট পরিমানে বাড়বে বলে আশা করা যায়।

২। **মানসম্মত বীজ উৎপাদনঃ** বাংলাদেশে যেসব বীজের সাহায্যে চাষ করা হয় সেগুলো রোগ ও কীটপতঙ্গ প্রবণ; তাছাড়া সেগুলো লবণাক্ত মাটিতে এবং বন্যায় ও খরায় চাষ করা যায় না। এ অবস্থায় পারমানবিক পদ্ধতিতে এমন বীজ উদ্ভাবন করা সম্ভব যা লবণাক্ততা বন্যা ও খরা সহিষ্ণু। এরকম বীজের সাহায্যে প্রতিকূল পরিস্থিতিতেও যথেষ্ট পরিমান উৎপাদন করা সম্ভব।

৩। **শস্য রোগ ও কীটপতঙ্গের আক্রমণ রোধঃ** বাংলাদেশে প্রতিবছর শতকরা প্রায় ১০ ভাগ শস্য রোগ ও পোকামাকড়ের আক্রমনে বিনষ্ট হয়। এ অবস্থায় গামা রশ্মির সাহায্যে পরিশোধিত রোগ ও কীটপতঙ্গ প্রতিরোধী বীজের চাষ করলে তা শস্যরোগ ও কীটপতঙ্গ থেকে ফসলকে রক্ষা করতে পারবে।

৪। **পানি ও সারের সুষ্ঠু ব্যবহারঃ** কৃষি কাজে যতটুকু সার ও পানির প্রয়োজন ততটুকু ব্যবহার করলে তার অপচয় রোধ হয় ও উৎপাদন ব্যয় কম থাকে। এ ক্ষেত্রে পারমানবিক পদ্ধতির সাহায্যে জমিতে প্রয়োজনীয় সার ও পানির পরিমাণ নির্ধারণ করতে পারলে একদিকে সার ও পানির অপচয় রোধ এবং অন্যদিকে উৎপাদন ব্যয় কম হবে।

৫। **বীজ সংরক্ষণ:** সনাতন পদ্ধতিতে শস্যবীজ বেশি দিন সংরক্ষণ করা যায় না; পারমানবিক বিকিরণের সাহায্যে উদ্ভাবিত উন্নতমানের শস্যবীজ যথাযথ ভাবে কয়েক বছর সংরক্ষণ করা যায়। তাই এমন বীজের সাহায্যে চাষাবাদ করলে ভবিষ্যতে বীজাভাবে কৃষিকাজ বিঘ্নিত হবে না।

কৃষিতে বায়োটেকনোলজি পদ্ধতির গুরুত্ব

১। **রোগ-প্রতিরোধী উদ্ভিদ উৎপাদন ও গবাদি পশু প্রজনন:** বাংলাদেশে প্রায়ই কীট-পতঙ্গ ও শস্য-রোগের দরুন ফসল বিনষ্ট হয় এবং বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হয়ে গবাদি পশুর মৃত্যু ঘটে। এ অবস্থায় জৈব প্রযুক্তির সাহায্যে নিয়ে রাগ ও কীটপতঙ্গ বিরোধী উদ্ভিদ উৎপাদন ও রোগ-প্রতিরোধী গবাদি পশু প্রজনন করা যায়। এমনটি হলে কৃষি উৎপাদনে ঝুঁকির মাত্রা কমবে এবং কৃষকরা হঠাৎ করে সমূহ ক্ষতির সম্মুখিন হবে না।

২। **অধিক উৎপাদনক্ষম প্রজাতির উদ্ভিদ উৎপাদন ও গবাদিপশু প্রজনন:** বাংলাদেশে উৎপাদিত অনেক ফসল নিম্নমানের; গবাদি পশু দুর্বল; মাংশ ও দুধ কম দেয়। এ অবস্থায় জৈব প্রযুক্তির সাহায্য নিয়ে এমন উদ্ভিদ উৎপাদন করা যায় যা অধিক ফসল/ফল দেয় এবং এমন গবাদি পশু প্রজনন করা যায় যা অধিক মাংস ও দুধ দেয়। এমনটি হলে ভবিষ্যতে বিভিন্ন শস্য, ফসল, দুধ ও মাংসের যোগান যথেষ্ট পরিমাণে বাড়বে।

কৃষি ক্ষেত্রে আইসিটির ব্যবহার ও তার গুরুত্ব

আইসিটি এর মাধ্যমে কৃষকেরা তাদের কম্পিউটারের সাহায্যে ঘরে বসেই কৃষি উৎপাদন ও কৃষি সম্পর্কিত সর্বশেষ বিভিন্ন তথ্য ও জ্ঞান লাভ করতে এবং উদ্ভাবিত কলাকৌশল ও তার প্রয়োগ সম্পর্কে জানতে পারে। নিম্নে বাংলাদেশের কৃষিতে আইসিটি এর ব্যবহার ও গুরুত্ব সম্পর্কে আলোচনা করা হলো:

ক. বাংলাদেশে কৃষিক্ষেত্রে আইসিটি এর ব্যবহার

বাংলাদেশে কৃষকদের কৃষি উৎপাদন ও কৃষি সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয়ে সহায়তা করার উদ্দেশ্যে আইসিটি ব্যবহারের ক্ষেত্রে ইতোমধ্যে যথেষ্ট অগ্রগতি হয়েছে। নিচে তার বিবরণ দেওয়া হলো:

১। **কৃষি তথ্য সার্ভিস:** বাংলাদেশ সরকারের কৃষি মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ কৃষি তথ্য সার্ভিস প্রতিষ্ঠানটি আইসিটি এর সাহায্যে কৃষকদেরকে কৃষিসংক্রান্ত তথ্য ও প্রযুক্তি জানতে সাহায্য করেছে। প্রতিষ্ঠানটি দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে সিনেমা ভ্যানে করে তথ্য ও প্রযুক্তি নির্ভর বিনোদনমূলক কৃষি অনুষ্ঠান প্রচার করছে। এক্ষেত্রে বিনোদন লাভের সাথে সাথে কৃষকরা কৃষি উৎপাদন সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয় জানতে পারছে। প্রতিষ্ঠানটি *WWW.ais.gov.bd* ওয়েবসাইটের মাধ্যমে তারা কৃষি উৎপাদনের সাথে জড়িত বিভিন্ন সমস্যার সমাধান পেতে পারে।

২। **ইন্টারনেট:** আজকাল বাংলাদেশের শিক্ষিত কৃষকেরা ইন্টারনেটের মাধ্যমে কৃষি-উৎপাদন ও পণ্য বিপণন সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয় জানতে পারে। কৃষি তথ্য সার্ভিস গ্রাম পর্যায়ে কৃষি তথ্য ও যোগাযোগ কেন্দ্র স্থাপন করে তার মাধ্যমে কৃষি তথ্য হস্তান্তরের ব্যবস্থা করে। এখন দেশে কৃষি তথ্য পাওয়ার জন্য কতগুলো ওয়েবসাইট রয়েছে এগুলো হল: *WWW.brri.gov.bd; www.bjri.gov.bd* ইত্যাদি। এসব ওয়েবসাইটের মাধ্যমে কৃষকরা কৃষি উৎপাদন সংক্রান্ত যেকোন সমস্যার সমাধান পেতে এবং পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থার সাথে পরিচিত হতে পারে।

৩। **টিভি চ্যানেল:** কৃষক ও কৃষির উন্নতির জন্য কৃষি তথ্য প্রদানের ব্যাপারে বাংলাদেশের টিভি চ্যানেল গুলো যথেষ্ট তৎপর ।এ প্রসঙ্গে চ্যানেল আই. এর হৃদয়ে মাটি ও মানুষ, বৈশাখীর কৃষি ও জীবন, বাংলাভিশনের শ্যামল ছায়া, জিটিভির সবুজ বাংলা, ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। এসব অনুষ্ঠানের মাধ্যমে কৃষকরা স্বচক্ষে কৃষির বিভিন্ন বিষয় অবলোকন করে যথেষ্ট জ্ঞান অর্জন ও প্রয়োগ করতে পারে।

৪। **মোবাইল ফোন :** বর্তমানে মোবাইল ফোন ব্যবহার করেও কৃষকরা কৃষিকাজ উপযোগী তথ্য ও পরামর্শ পেতে পারে । মোবাইল কোম্পানি বাংলা লিংক- এর জিজ্ঞাসা ৭৬৭৬ নম্বরটি কৃষি সংশ্লিষ্ট সেবাদানের জন্য উন্মুক্ত রেখেছে । কৃষকরা গ্রামাঞ্চলে ,সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে পরিচালিত কৃষি কল সেন্টারগুলোতে কল করে সরাসরি অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের কাছ থেকে কৃষি বিষয়ক বিভিন্ন সমস্যার সমাধান পেতে পারে ।

এভাবে দেখা যায়, আইসিটি ব্যবহার করে কৃষকরা সহজেই দেশ ও দেশের বাইরের কৃষি বিষয়ক বিভিন্ন তথ্য ও উপাত্ত জানতে এবং তার সাহায্যে সুষ্ঠুভাবে কৃষিকাজ পরিচালনা করতে পারে ।

খ. বাংলাদেশের কৃষিতে আইসিটি ব্যবহারের গুরুত্ব

বর্তমানকালে ফলপ্রসূ উপায়ে কৃষিকাজ পরিচালনার জন্য আইসিটির ব্যবহারের বিকল্প নেই। নিচে বাংলাদেশের কৃষিতে আইসিটি ব্যবহারের গুরুত্ব আলোচনা করা হল:

১। আবাহাওয়া সংক্রান্ত তথ্য প্রাপ্তি: কৃষিকাজে আবহাওয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সময় মতো বীজ বপন, চারা তৈরি, রোপন, কীটনাশক প্রয়োগ ইত্যাদি ক্ষেত্রে আগাম আবহাওয়া বিষয়ক তথ্য জানা একান্ত প্রয়োজন। আবহাওয়ার সাথে সামঞ্জস্য বিধান করে শস্য ও মৎস্য ক্ষেত্রে কতগুলো পরিপূরক ও প্রতিরোধমূলক কার্যক্রম গ্রহন করা যায়। তাছাড়া,কৃষিকাজ সুষ্ঠুরূপে পরিচালনার জন্য কৃষকদেরকে জলবায়ু পরিবর্তন জনিত সমস্যা ও সমাধান,প্রাকৃতিক দূর্যোগের পূর্বাভাস ইত্যাদি সম্পর্কেও অবিহিত হতে হয়।

২। উন্নত উপকরণের তথ্য সংগ্রহ: আজকাল কৃষি উৎপাদনের মান ও পরিমান বৃদ্ধির জন্য দেশে দেশে উন্নততর বীজ, সার ও কীটনাশক উদ্ভাবিত হচ্ছে। এর সাথে রয়েছে নতুন নতুন কৃষি যন্ত্রপাতির ব্যপারও। মানসম্মত সর্বাধিক কৃষিফলন পাওয়ার জন্য সর্বত্তম কৃষি উপকরণ ও টেকসই প্রযুক্তির নির্বাচন প্রয়োজন। এ ক্ষেত্রে যথার্থ তথ্য দ্রুত পেতে হলে আইসিটির ব্যবহার আবশ্যক।

৩। কৃষি উপকরণ সমূহ ব্যবহারের নিয়ম-কানুন: কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে উন্নত ও আধুনিক কৃষি যন্ত্রপাতি ও উপকরণ সংগ্রহের সাথে সাথে তার ব্যবহারের নিয়মকানুন জানা অত্যাবশ্যক। এক্ষেত্রে ইন্টারনেটের বিভিন্ন ওয়েবসাইট ব্যবহার করে প্রয়োজনীয় বিষয় সহজেই জানা যায়।

৪। কৃষি উৎপাদন সর্বাধিক করার ক্ষেত্রে : কৃষি-উৎপাদন সর্বাধিক করার জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ সমূহ সময়মতো ও প্রয়োজনীয় পরিমাণে সংগ্রহ করা দরকার। এক্ষেত্রে আইসিটি ব্যবহারের মাধ্যমে সব ধরনের তথ্য পাওয়া যেতে পারে।

৫। রোগবালাই দমন: নতু উদ্ভাবিত বীজ ব্যবহার করতে গিয়ে ক্ষতিকর ব্যাকটেরিয়া, ভাইরাস ইত্যাদির আক্রমনে ফসল নষ্ট হওয়ার আশংকা থাকে। এক্ষেত্রে রোগ-বালাই দমনের উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য আইসিটির ব্যবহার করা আবশ্যক।

৬। বিভিন্ন কাজের মধ্যে সমন্বয় সাধন: কৃষিকাজ করে আশানুরূপ ফল পেতে হলে উৎপাদনের উদ্দেশ্যে পরিচালিত সকল কাজের মধ্যে সমন্বয় সাধন জরুরি। এক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ ও দিক নির্দেশনা পেতে হলে আইসিটির ব্যবহার করা আবশ্যক।

সুতরাং বলা যায়,কৃষিখাতকে অধিক উৎপাদনক্ষম করতে হলে আমাদের কৃষকদেরকে ধীরে ধীরে আইসিটির ব্যবহারে তৎপর হতে হবে।

বাংলাদেশের কৃষিতে উন্নত বীজের উদ্ভাবনের প্রভাব:

উন্নত ধরনের উদ্ভাবিত বীজ সম্পর্কিত প্রযুক্তি কোনো একক বা বিচ্ছিন্ন প্রযুক্তি নয়,বরং এটি কয়েকটি প্রযুক্তির সমন্বয়ের প্রকাশ। এ প্রযুক্তির পাঁচটি প্রয়োজনীয় উপাদান হলো−(১) উন্নত বীজ,(২) আধুনিক সেচ সুবিধা, (৩) রাসায়নিক সার, (৪) কীটনাশক ও (৫) প্রাতিষ্ঠানিক কৃষি ঋণ। বাংলাদেশে উন্নত ধরনের উদ্ভাবিত বীজ সম্পর্কিত প্রযুক্তির ফলাফল যথেষ্ট উৎসাহব্যঞ্জক।

উন্নত উদ্ভাবিত বীজ এর প্রযুক্তি ব্যবহারের ফলে শস্য উৎপাদনে লক্ষণীয় পরিবর্তন এসছে। আগের চেয়ে কম পরিমান জমিতে পূর্বের তুলনায় উৎপাদন অনেক বেশি পাওয়া যাচ্ছে। সামগ্রিকভাবে খাদ্যোৎপাদন বাড়ায় তা দেশের বিশাল জনোগষ্ঠীর বর্ধিত খাদ্য-চাহিদা পূরণ তথা খাদ্য নিরাপত্তা অর্জনে সহায়ক হচ্ছে। উন্নত ধরনের উদ্ভাবিত বীজ ব্যবহারের ফলে চাষের নিবিড়তা বেড়েছে ও শস্যের বহুমুখীকরণ ঘটছে। এখন উত্তম উপায়ে ভূমি কর্ষণ,উপযুক্ত পরিমানে পাণি সেচ ও সার প্রয়োগ করে একই সঙ্গে একাধিক ফসল আবাদ করা যাচ্ছে।দীর্ঘ বিরতি ছাড়া একর পর এক শস্য আবাদ কিংবা একের সঙ্গে অন্য শস্য চাষ করা সম্ভব হচ্ছে। তাছাড়া পরিবেশ দূষণ,বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধি ও ঝরবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতিকর প্রভাব মোকাবেলায় অর্থাৎ অভিযোজনের কাজে উন্নত উদ্ভাবিত বীজ যথেষ্ট সহায়ক হচ্ছে। এক্ষেত্রে বর্তমানে ব্যবহৃত লবনাক্ততা সহিষ্ণু বিনা-৮ ও ব্রি-৪৭,লবণাক্ততা প্রবণ এলাকার জন্য ব্রি-ধান-৫৩ ও ৫৪,বন্যাপ্রবণ এলাকার জন্য ব্রি ধান-৫১ ও ৫২ ইত্যাদি উন্নত বীজের কথা উল্লেখ করা যায়।

উন্নত ধরনের উদ্ভাবিত বীজ ব্যবহারের ফলে সামগ্রিক কর্মসংস্থানের উন্নতি হয়েছে। কেননা উৎপাদন ক্ষেত্রে ব্যবস্থাপণা,গভীরভাবে ভূমি কর্ষণ,সার প্রদান,পাণি সেচ এবং আনুষঙ্গিক প্রতিটি কাজের বর্ধিত শ্রমের প্রয়োজন হওয়ায়

গ্রামাঞ্চলে কর্মসংস্থান বেড়েছে। উফসি প্রযুক্তির ফলে কৃষিতে অবিরাম চাষ পদ্ধতি প্রবর্তিত হওয়ায় গ্রামাঞ্চলে মৌসুমি বেকারত্ব হ্রাস পেয়েছে। তাছাড়া বছরে পূর্বের একবারের জায়গায় দুই/তিন বার উপকরণ ও ফসল আনা নেওয়া কারনে গ্রামে রাস্তা ঘাট নির্শাণ ও ঘন ঘন সংস্কার করতে হচ্ছ। এ সব কাজে অনেক লোক নিয়োজিত হতে পারছে। নতুন ধরনের উদ্ভাবিত বীজের সাহায্যে চাষাবাদের ফলে কৃষি কাজের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলের আয় বাড়ায় গ্রামীণ জীবনযাত্রার মান উন্নত হচ্ছে।

উন্নত ধরনের উদ্ভাবিত বীজ সম্পর্কিত প্রযুক্তি ব্যবহারের ফলে কৃষিতে অবশ্য কিছু নেতিবাচক প্রভাব লক্ষ করা যাচ্ছে। উন্নতমানের বীজ,সার,কীটনাশক,প্রাতিষ্ঠানিক ঋণ ইত্যাদি দরিদ্র কৃষকের চেয়ে ধনি কৃষকরায় বেশি সংগ্রহ করতে পারায় তারাই তুলনামূলক ভাবে বেশি লাভবান হচ্ছে। এর ফলে গ্রামঞ্চলে ধনী ও দরিদ্র কৃষকদের মধ্যে আয় বৈষম্য বেড়েছে। তাছাড়া উন্নত বীজ চাষাবাদের দরুন শস্যের দেশীয় প্রজাতিসমূহের বিলুপ্তি ঘটছে। রাসায়নিক সার ব্যবহারের কারণে জমি ক্রমেই শক্ত ও অনুর্বর হয়ে পরছে। গভির নলকূপের সাহায্য ব্যপকভাবে পাণি সেচের ফলে ভূগর্ভস্থ পাণির স্তর ক্রমেই নিচে নেমে যাচ্ছে।এসব ছাড়াও নতুন উদ্ভাবিত বীজচাষের কারণে কৃত্রিম সার ও কীটনাশক ব্যবহারের ফলে নদ-নদী,পুকুর-পুষ্করিনী ও খাল-বীলের পাণি ক্রমেই দূষিত হওয়ায় মাছ চাষ কঠিন হয়ে পড়েছে এবং যথেচ্ছা কীটনাশক ব্যবহারের ফলে শস্যের অবাঞ্ছিত রোগবালাই বাড়ছে।

সামগ্রিক বিচারে অবশ্য এ কথা বলা যায়, নতুন উদ্ভাবিত বীজের চাষাবাদের দরুণ সৃষ্ট নেতিবাচক প্রভাব ন্যূনতম পর্যায়ে রাখতে পারলে এর সাহায্যে চাষাবাদ আগামীতে সুফল বয়ে নিয়ে আসবে।

পরিবেশ দূষণ, বৈশ্বিক উষ্ণতা ও জলবায়ু পরিবর্তন জনিত পরিস্তিতির সাথে অভিযোজনের উপায় বর্ণনা :

বিশ্ব উষ্ণায়নের জন্য কোনোভাবেই দায়ী না হওয়া সত্ত্বেও জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাবের শিকার বাংলাদেশ। এ সমস্যা মোকাবেলায় অভিযোজন তথা পরবর্তিত পরিস্থিতির সাথে খাপ খাওয়ানোর কার্যক্রমে সরকার ইতোমধ্যে আন্তর্জাতিক ও দেশীয় পর্যায়ে বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহন করেছে। এসবের সাথে এক্ষেত্রে সাধারণ কিছু ব্যবস্থা গ্রহন প্রয়োজন। নিচে এসব বিষয় আলোচনা করা হলো:

আন্তর্জাতিক পর্যায়ে গৃহীত ব্যবস্থা

জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতিকর প্রভাব মোকাবেলায় বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক উদ্যোগে একাত্মতা ঘোষনা করেছে। বাংলাদেশ এ পর্যন্ত পরিবেশ সংক্রান্ত প্রায় ২৮টি চুক্তি, কনভেনশন ও প্রটোকলে স্বাক্ষরদান করেছে। এগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত কনভেনশন– এজেন্ডা-২১, কমব্যট ডেজার্টিফিকেশন, সমুদ্রদূষণ কনভেনশন ইত্যাদি। এছাড়া রয়েছে বিশ্ব ব্যাপি কার্বণ নির্গমন কমিয়ে আনার জন্য কোপেনহেগেন সমঝোতা চুক্তি, ২০০৯; জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য দায়ী উন্নত দেশগুলোর কাছ থেকে ন্যায্য হিস্যা আদায়ের জন্য ক্লাইমেট চেঞ্জ নেগোশিয়েশন টিম গঠন,জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব রোধে ও অভিযোজন কার্যক্রমে গতিশীলতা আনয়নের জন্য কানকুন জলবায়ু সম্মেলন, ২০১০ কিয়োটো প্রটোকল ডারবান জলবায়ু সম্মেলন, ২০১১ দোহা জলবায়ু সম্মেলন, ২০১২; ওয়ারশ সম্মেলন প্রভৃতি।

দেশীয় পর্যায়ে গৃহীত কার্যক্রম

পরিবেশ দূষণের সাথে সাথে অভিযোজনের জন্য বাংলাদেশ সরকার ইতোমধ্যে নীতি নির্ধারণ ও কয়েকটি আইন প্রণয়ন করছে। এগুলোর মধ্যে জাতীয় পরিবেশ নীতি (১৯9২), জাতীয় পরিবেশ এ্যাকশন প্লান (১৯৯২), বন নীতি (১৯৯৪) বনায়ন মাস্টার প্লান (১৯৯৩-২০১২) ইত্যাদি প্রধান। উল্লেখযোগ্য আইনের মধ্যে আরও রয়েছে মৎস্য সংরক্ষণ আইন (১৯৮৯) ইত্যাদি। এসব আইন বিভিন্নভাবে কৃষিতেও পরিবেশ দূষণ রোধে সহায়ক। জলবায়ু পরবর্তনজনিত ঝুঁকি মোকাবেলা ও অভিযোজন কর্মসূচি ত্বরান্বিত করার উদ্দেশ্যে সরকার নিজস্ব তহবিলের মাধ্যমে বিভিন্ন পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করছে।

বাংলাদেশের কৃষি ক্ষেত্রে জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব মোকাবেলার জন্য গৃহীত উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপগুলো হলো-

১। পরিবর্তিত জলবায়ু উপযোগী ধানভিত্তিক প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও সম্প্রসারণ প্রকল্প।

২। জামালপুর ও শেরপুর জেলার চর এলাকার নাজুক কৃষকদের খাদ্য নিরাপত্তা ও খামারের উৎপাদন বৃদ্ধি প্রকল্প।

৩। জলবায়ু পরিবর্তনে চরম হুমকির মুখে প্রতিকূল পরিবেশে অবস্থানকারী নারী ও শিশুর জন্য সুপেয় পানি সরবরাহ ও সামাজিক সুরক্ষাকরণ প্রকল্প।

৪। জলাভূমি, বন পুনরুদ্ধার ও জীব বৈচিত্র সংরক্ষণ প্রকল্প।

৫। উপকূলীয় এলাকায় বনায়ন প্রকল্প।

৬। পোল্ডার ৫ এর বেড়ি বাধ ও অবকাঠামো নির্মাণের মাধ্যমে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলা প্রকল্প।

৭। মাল্টিপারপাস সাইক্লোন সেন্টার নির্মাণ প্রকল্প।

৮। জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতিকর প্রভাব মোকাবেলায় (i) জলাভূমির বন পুনরুদ্ধার ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ প্রকল্প এবং (ii) উপকূলীয় এলাকায় বনায়ন প্রকল্প।

উল্লেখ্য কৃষিতে পরিবেশ দূষণের সাথে অভিযোজনের জন্য কিছু কার্যকর ব্যবস্থাও গ্রহন করা যায়। এগুলো নিম্নরূপ:

– পরিবেশগত সমস্যা সম্পর্কে কৃষকদেরকে সচেতন এবং পরিবেশ সংরক্ষণে অংশীদারিত্ব মূলক কার্যক্রমে অংশ গ্রহন করতে উদ্বুদ্ধ করা।
– বিদ্যমান দুর্যোগগ্রস্থ ও দুর্যোগপ্রবন আঞ্চলগুলোতে সতর্ক নজরদারি।
– আসন্ন দুর্যোগ পরিস্থিতি, পরবর্তি চাহিদা ও ব্যবস্থাপনা কৌশল সম্পর্কে পূর্বাভাস প্রদান যা বিপর্যয়ের ক্ষয়ক্ষতি হ্রাসে সহায়ক।
– কৃষিতে পরিবেশ দূষণ ও ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে কৃষকদেরকে অবহিত ও সচেতন করে তোলে।
– গবাদি পশু পালনের মধ্য দিয়ে অধিক গোবর সার সৃষ্টি ও তা ব্যবহার করতে কৃষকদেরকে উৎসাহিত করা।
– গোবর সার, গো-মূত্র, ছাই ইত্যাতি দ্বারা জৈব কীটনাশক উৎপাদন।
– আর্সেনিকমুক্ত পানি সরবরাহ।
– রাসায়নিক সার ও কীটনাশকের নিয়ন্ত্রিত ব্যবহার।
– মজা ও পরিত্যক্ত পুকুর সংস্কার ও তার রক্ষাণাবেক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহন।
– গ্রামাঞ্চলে ভরাট হয়ে যাওয়া নদীগুলো পুনরূদ্ধার ও খনন।
– জলাবদ্ধতা দূর।
–আধুনিক চাষ পদ্ধতিতে কৃষকদেরকে উৎসাহিত করা। এ লক্ষ্যে উচ্চ তাপমাত্রা সহনশীল, লবণাক্ত মাটিতে চাষ করা যায় ও বালাই প্রতিরোধক্ষম এমন শস্যের জাত উদ্ভাবন এবং ভাসমান পদ্ধতিতে কচুরিপানার উপর সবজি চাষ।
  – বন্যার পানি থেকে নিরাপদ থাকার জন্য বসত ভিটা উঁচু করা।
  – বন্যাপ্রবণ বা অধিক বৃষ্টি যুক্ত অঞ্চলে পুকুরের পার উঁচু করে বাধা।
  – জলাবদ্ধ পানিতে পরিকল্পিত উপায়ে মাছ চাষ।
– পুকুরে সাবান দিয়ে কাপড় কাচা বন্ধ করা ।

শিক্ষার্থীর কাজ

১। বাংলাদেশের কৃষির উন্নয়নে পারমানবিক শক্তি, বায়োটেকনোলজি পদ্ধতি এবং আইসিটি ব্যবহারের গুনগত পরিবর্তন উন্নত বিশ্বের আলোকে পর্যলোচনা করবেন।

২। উন্নত বীজের উদ্ভাবন কিভাবে ঘটিত হয় এবং বাংলাদেশের কৃষিতে তার প্রভাব বর্ণনা করবেন।

৩। পরিবেশ দূষণের কারণগুলো কি কি বলবেন। বৈশ্বিক উষ্ণতার প্রভাব বর্ননা করবেন। জলবায়ু পরিবর্তন জনিত পরিস্থিতি সাথে অভিযোজনের প্রক্রিয়া বর্ণনা করবেন।

সারসংক্ষেপ

- কৃষিতে পারমানবিক পদ্ধতি/প্রযুক্তি ব্যবহৃত হচ্ছে তার মধ্যে পারমানবিক ও বায়োটেকনোলজি পদ্ধতি/প্রযুক্তি অন্যতম।
- কৃষিক্ষেত্রে পারমানবিক শক্তি বিকিরণকে নিয়ন্ত্রিত উপায়ে কাজে লাগানোই হলো পারমানবিক কৃষি পদ্ধতি/প্রযুক্তি।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ২.৭

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। এদেশে পূর্ব থেকেই জমির মালিকানা পরিবার পিছু কত বিঘা নির্ধারণ করা হয়েছে?
ক) ৬০ বিঘা খ) ৮০ বিঘা গ) ৯০ বিঘা ঘ) ১০০ বিঘা

২। বাংলাদেশে বর্তমানে কোন ধরনের ভূমিস্বত্ব ব্যবস্থা প্রচতি রয়েছে?
ক) জমিদারি প্রথা খ) মহলওয়ারি প্রথা গ) রয়তওয়ারি প্রথা ঘ) বর্গাদারি প্রথা

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সৃজনশীল প্রশ্ন:

১। রহিম মিয়া রাজশাহী জেলার একজন গরিব চাষি। তার সামান্য জমি আছে। তিনি সনাতন পদ্ধতিতে চাষাবাদ করেন। কিন্তু তার পরিচিত অন্যান্য কৃষকেরা কৃষি ব্যাংক থেকে ঋন নিয়ে আধুনিক পদ্ধতিতে চাষাবাদ করেন। ফলে উৎপাদন বৃদ্ধি করে আয়ও বৃদ্ধি করেছে। এসব দেখে রহিম মিয়াও কৃষি ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে নতুন পদ্ধতিতে চাষাবাদ করা শুরু করেন।

ক) কৃষিকাজ কী?
খ) সনাতন পদ্ধতিতে চাষাবাদ বলতে কী বুঝায়?
গ) রহিম মিয়া কৃষি ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে কী ধরনের আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে উৎপাদন বৃদ্ধি করতে পারেন?
ঘ) বাংলাদেশে রহিম মিয়ার মতো কৃষকদের ভাগ্য পরিবর্তনের সমবায় সমিতির ভূমিকা মূল্যায়ন করুন।

২। রহিম মিয়া একজন বুদ্ধিমান কৃষক। কিন্তু যথেষ্ট পরিশ্রম করা সত্ত্বেও তার জমিতে আশানুরূপ ফসল উৎপাদিত হয় না ফলে ফসল বাজারজাতকরনের ব্যাঘাত ঘটে। একদিন একটি কৃষি বিষয়ক সেমিনারে অংশগ্রহন করেন,মাল্টিমিডিয়ার কিছু প্রমান্য চিত্র দেখে অনুপ্রাণিত হন এবং নতুন উদ্দ্যমে কৃষি কাজ করেন।

ক) কৃষি বানিজ্যিকিকরণ বলতে কী বুঝায়?
খ) কৃষি বানিজ্যিকিকরনে সমস্যা কী?
গ) রহিম মিয়া কিভাবে বানিজ্যিকিকরণে সফল হল।
ঘ) বাংলাদেশে সুষ্টু কৃষিপণ্য বিপননে কি পরামর্শ দিবে?

৩। রহিম ও করিম দুই বন্ধু। তারা উচ্চ শিক্ষিত যুবক। দীর্ঘদিন চেষ্টা করেও কোনো ভালো চাকরি না পেয়ে তাদের আর এক বন্ধুর পরামর্শে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে প্রশিক্ষণ নেয়। এরপর উক্ত সংস্থা থেকে ঋণ নিয়ে তাদের গ্রামের পুকুরের সমন্বিত মাছ ও হাঁসের চাষ শুরু করে। আর পুকুরের পাড়ে করে নার্সারি। তাদের ফার্মে বর্তমানে ২০ জন শিক্ষিত যুবক কাজ করে। রহিম ও করিম শুধু নিজেদের বেকার সমস্যার সমাধানই করেনি বরং পর্যাপ্ত মুনাফা অর্জনের মাধ্যমে দেশের অর্থনীতিতেও গুরুত্বপূর্ণ আবদান রাখছে।

ক) রহিম ও করিম যে পদ্ধতিতে নিজেদের কাজের ব্যবস্থা করেছে তাকে অর্থনীতিতে কী বলে?
খ) এরূপ কর্মসংস্থানের একটি গুরত্বপূর্ণ সুবিধা বর্ণনা করুন।
গ) রহিম ও করিমের অভিজ্ঞতার আলোকে আপনার নিজ এলাকার শিক্ষিত বেকার দের স্বকর্মসংস্থানের উপায় ব্যাখ্যা করুন।

ঘ) বাংলাদেশের কৃষিক্ষেত্রে আত্মকর্মসংস্থানের মাধ্যমে বেকার সমস্যা দূর করা সম্ভব-এ উক্তিটির যথার্থতা মূল্যায়ন করুন।

৪। সেলিম, রহিম, করিম তিন গরীব কৃষক। তদের জমির পরিমান খুবই কম। কোন রকমে গরু লাঙল দিয়ে চাষাবাদ করে। একদিন তারা সিদ্ধান্ত নিল তাদের জমি একত্র করে ট্রাক্টর সেচ ও উন্নত বীজ ব্যবহার করবে। সে অনুযায়ী চাষাবাদের ফলে উৎপাদন বৃদ্ধ পেল এবং প্রত্যেকের আয় অনেক বৃদ্ধি পেল। পরবর্তিতে অন্যান্য কৃষকরাও তাদের অনুসরণ করে তাদের আয় বৃদ্ধিতে সক্ষম হলো।

ক) কৃষি জোত কী?

খ) কৃষিজোত ও কৃষি খামরের মধ্যে পার্থক্য দেখান।

গ) সেলিম, রহিম ও করিম কীভাবে তাদের ভাগ্য উন্নয়ন করতে সক্ষম হল? ব্যাখ্যা করুন।

ঘ) সেলিম, রহিম,করিম এর অভিজ্ঞতার আলোকে বাংলাদেশের কৃষি জোত ও কৃষি খামারের গুনগত পরিবর্তন এনে দেশের কৃষকদের আর্থিক আয় বৃদ্ধি করা যাবে? ব্যাখ্যা করুন।

৫। জামাল মিয়া একজন সাধারণ কৃষক। যথেষ্ট পরিশ্রম করা সত্ত্বেও তার জমিতে আশানুরূপ ফসল উৎপাদিত হয় না। হঠাৎ তিনি একটি কৃষি বিষয়ক সেমিনারে অংশগ্রহন করেন এবং নানা রকম কৃষি বিষয়ক উপদেশ ও জ্ঞান লাভ করেন। সেমিনারে মাল্টিমিডিয়ায় কিছু প্রামান্য চিত্র দেখে অনুপ্রাণিত হন এবং নতুন উদ্যোগে কৃষিকাজ শুরু করেন।

ক) কৃষি কাজ কাকে বলে?

খ) বাণিজ্যিক উৎপাদনের জন্য কৃষিকাজ বলতে কী বুঝেন?

গ) জালাল মিয়ার জমিতে আশানুরূপ ফসল উৎপাদন না হওয়ার কারণটি ব্যাখ্যা করুন।

ঘ) সেমিনারে অংশ নেওয়ার পরে জালাল মিয়ার কৃষি উৎপাদন কেন বৃদ্ধি পাবে বলে আপনি মনে করেন।

উত্তরমালা

পাঠ ২.১:	১। ক	২। গ	৩। খ	৪। গ	৫। গ	৬। গ	৭। গ	৮। ক	৯। খ
পাঠ ২.২:	১। গ	২। খ							
পাঠ ২.৩:	১। ঘ	২। ঘ							
পাঠ ২.৪:	১। গ	২। খ	৩। গ						
পাঠ ২.৫:	১। গ	২। খ	৩। ঘ	৪। ক	৫। গ				
পাঠ ২.৬:	১। ঘ	২। ঘ	৩। ক	৪। খ	৫। খ				
পাঠ ২.৭:	১। ক	২। ঘ							